মুকাশাফাতুল-কুলূব

বা

আত্মার আলোকমণি

প্রথম খণ্ড

মূল

হুজ্জাতুল ইসলাম

ইমাম আবু হামেদ মুহাম্মদ আল-গায্যালী (রহঃ)

অনুবাদ

মুফ্তী মুহাম্মদ উবাইদুল্লাহ

মুহাদ্দিস, জামেয়া আরাবিয়্যাহ্, ফরিদাবাদ, ঢাকা

খতীব, ১নং সিদ্দিক বাজার জামে মসজিদ, ঢাকা

দারুল ইফ্তা প্রকাশনী

১নং সিদ্দিক বাজার, ঢাকা, বাংলাদেশ

(নওয়াবপুর রোড সংলগ্ন ঢাকা হোটেলের বিপরীতে)

ইসলামী সাহিত্যের গৌরব, বিশিষ্ট জ্ঞানতাপস, মাসিক মদীনা সম্পাদক
মাওলানা মুহিউদ্দীন খানের

ভূমিকা

সর্বকালের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক লোক-শিক্ষক হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম আবু হামেদ মুহাম্মদ আল-গাযালী (রাহঃ)-রচিত মুকাশাফাতুল-কুলূব একটা মহামূল্যবান গ্রন্থ। একশত এগারটি অধ্যায়ে সমাপ্ত এই বিরাটায়তন গ্রন্থটি ইমাম সাহেবের সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'এহ্‌য়াউ উলুমুদ্দীন'-এর প্রায় সমপর্য্যায়ের। এ অমূল্য গ্রন্থটি আমাদের দেশে একপ্রকার অপরিচিত রয়ে গিয়েছিল। বৈরুত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ শায়খ মুহাম্মদ রশীদ আল-কোব্বানী দুষ্প্রাপ্য সেই গ্রন্থটি সম্পাদনা করে সম্প্রতি সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করেছেন। ফলে ইমাম গাযালীর (রাহঃ) এ গ্রন্থটির সাথেও আধুনিক বিশ্বের পরিচিতি লাভ সহজ হয়েছে।

ইমাম গাযালীকে (রাহঃ) হিজরী পঞ্চম শতকে প্রকাশিত হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটা অত্যুজ্জ্বল মোজেযারূপে চিহ্নিত করা হয়। কারণ, প্রাথমিক পাঁচশো বছরের সময়কালের মধ্যে অর্জিত অকল্পনীয় পার্থিব সমৃদ্ধি মুসলিম উম্মাহর দৃষ্টিকে জীবনের প্রধান লক্ষ্য আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক সুদৃঢ়করণের কথা যখন অনেকটা ভুলিয়ে দিয়েছিল, ঠিক সেরূপ একটা ক্রান্তিকালে ইমাম গাযালীর (রাহঃ) আবির্ভাব ঘটে। তাঁর সাধনাঋদ্ধ ক্ষুরধার লেখনী পথহারা মুসলিম উম্মাহকে নতুন করে জাগিয়েছিল। আর সেটা ঘটেছিল আত্মার জাগরণ। বলা হয় যে, ইমাম গাযালীর (রাহঃ) লেখনী দ্বারাই পরবর্তীকালে নূরুদ্দীন জঙ্গী সালাহউদ্দীন আইয়ূবী প্রমুখ দরবেশ রাজন্যবর্গের আবির্ভাব সম্ভব হয়েছিল। ইতিহাস যাঁদের চিহ্নিত

করেছে উম্মতের শ্রেষ্ঠ সন্তানরূপে। ইমাম গাযালীর (রাহঃ) নির্দেশেই তাঁর জনৈক সাগরেদ মাগরেব বা মরক্কোয় একই ইসলামী দল গঠন ও ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করেছিলেন।

ইমাম গাযালীর (রাহঃ) দর্শন পবিত্র কোরআন ও বিশুদ্ধ সুন্নাহ নির্ভর। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, অন্তরমধ্যে আল্লাহ্‌র ভয় ও আখেরাতের জীবন সম্পর্কে পরিপূর্ণ একীন সৃষ্টি না করা পর্যন্ত পশুজীবনের সাথে মানুষের পার্থক্য সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। ভয় ও একীন ছাড়া মানুষ হিংস্র পশুর চাইতে কোন অংশে কম তো নয়ই বরং বুদ্ধিদীপ্ত প্রাণী হওয়ার কারণে অবিশ্বাসী মানব সন্তান হিংস্র পশুর চাইতে অনেক বেশী মারাত্মক হয়ে থাকে। তিনি আরও বিশ্বাস করতেন যে, প্রকৃত মনুষ্যত্বের জাগরণ শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বা গতানুগতিক ধর্মাচরণ দ্বারা সম্ভবপর নয়। কারণ, মানুষের শত্রু তার নিজের মধ্যেই অবস্থান করে। নাফ্স রূপী সে শত্রুই শয়তানের বাহন। সুতরাং সে শত্রুর মুখে লাগাম এঁটে ওটা খোদাভীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করতে পারলেই প্রকৃত মনুষ্যত্বের স্তরে উপনীত হওয়া সম্ভব। এ উপলব্ধি তে উদ্বেলিত হয়েই যুগের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীপুরুষ গাযালী (রাহঃ) রাজকীয় পদমর্যাদা এবং বর্ণাঢ্য জীবন পরিত্যাগ করে নিরুদ্দেশের যাত্রী হয়েছিলেন। সে যাত্রারই অমৃতময় ফসল তাঁর রচিত সবগুলি অমর গ্রন্থ।

আধ্যাত্মিকতা কি এবং তা অর্জন করার পথই বা কোন্‌টি তা অনুধাবন করার জন্য ইমাম গাযালীর গ্রন্থাবলী পাঠ করাই যথেষ্ট। জীবনের তাৎপর্য ও তা উপভোগ করার যেসব পদ্ধতি তিনি বলে গেছেন, জীবনপথে চলতে গিয়ে যে সব বৈরী শক্তির মোকাবেলা করতে হয়, সেগুলিকে যেভাবে তিনি চিহ্নিত করেছেন, তা সর্বকালেই চিরনতুন হয়ে থাকবে। প্রায় হাজার বছর অতিক্রান্ত হয়েছে, কিন্তু এখনও গাযালীর লেখা পুরাতন হয়নি। দেশ-কালের সীমানা পেরিয়ে যারাই তাঁর লেখার সাথে পরিচিতি লাভ করতে চায়, তাদের চোখেই সর্বপ্রথম যে সত্যটি ধরা পড়ে, তা হচ্ছে, ইমাম সাহেব যেন সে যুগ এবং সে যুগের লোকগুলিকে লক্ষ্য করেই কথা বলছেন। মানবমনের এতটা গভীরে অন্য কোন দার্শনিক বা লোকশিক্ষক প্রবেশ করতে পেরেছেন বলে আমার জানা নাই। তাই ইমাম গাযালীর রচনা পাঠ করে কোনদিনই রেখে দেওয়া যায়

না। যতই পড়া যায়, ততই যেন আত্মার ক্ষুধা বাড়তে থাকে। মনে হয় প্রতিটি মানুষের নিজস্ব চিন্তা-চৈতন্য নিয়েই বুঝি তিনি কথা বলেছেন।

বাংলাভাষায় ইমাম গাযালীর (রাহঃ) বেশ কয়েকটি গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এখনও এমন অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রয়ে গেছে, যেগুলির নামও এদেশে অনেকের জানা নাই। স্নেহভাজন মাওলানা মুফতী উবায়দুল্লাহ্ সাহেব বছরখানেক আগে বিশেষ একটি প্রশিক্ষণ উপলক্ষে কায়রোতে কিছুকাল অবস্থানের সুযোগে সেরূপ কয়েকখানা দুষ্পাপ্য পুস্তক সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছেন। তন্মধ্যে 'বিদায়াতুল-হিদায়াহ্' নামক পুস্তকখানি তিনি ইতিপূর্বে অনুবাদ করে বাংলাভাষাভাষী পাঠকগণকে উপহার দিয়েছেন। 'মুকাশাফাতুল-কুলুব' তাঁর দ্বিতীয় উপহার। আলোচ্য গ্রন্থটি নিয়ে বিস্তর তাত্বিক আলোচনার অবকাশ রয়েছে। এতে যেন ইমাম সাহেব পাঠকগণকে সহজ-সরল পন্থায় আধ্যাত্মিকতার সর্বোচ্চ স্তরে নিয়ে যেতে চেষ্টা করেছেন। বইটি পাঠ করলে মনে হয়, পরম প্রিয় মাওলার সান্নিধ্য লাভ করাটাই বুঝি বান্দার নিতান্তই সহজাত একটা সাধনা। এ পথে জটিলতা বা রহস্যময়তা বলতে বুঝি কোন কিছুর অস্তিত্ব নাই।

আমাদের দেশ আজ আধ্যাত্মিকতার নানা দাবী-দাওয়ার সয়লাবে টই-টুম্বুর হয়ে রয়েছে। কত কিছিমের মারেফাত-চর্চা যে এদেশে হচ্ছে, তা শুমার করে শেষ করাও কঠিন। আর এসব নামধারী মারেফাতসেবীদের প্রধান শিকারই হচ্ছে প্রকৃত ধর্মজ্ঞান বর্জিত সমাজের শিক্ষিত-উচ্চবিত্ত শ্রেণীটা।

উম্মতের মধ্যে যে যুগে যে ধরনের গোমরাহীর প্রাদুর্ভাব বেশী হয়, দ্বীনের সেবক আলেম সমাজের দৃষ্টি আল্লাহ পাক সে সবের প্রতিবিধান-চিন্তার দিকে ফিরিয়ে দেন। বিগত ইতিহাসের বহু ক্রান্তিলগ্নে এ সত্যটি বারবার প্রমাণিত হয়েছে। বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে ইমাম গাযালী (রাহঃ) পরিবেশিত অমৃতধারার প্রয়োজনীয়তা বড় বেশী বলে মনে করি। আনন্দের বিষয় যে, এ যুগের কিছুসংখ্যক প্রতিভাদীপ্ত আলেমের শ্রম-সাধনা গাযালীর রচনাবলী বাংলাভাষায় প্রকাশ করার প্রতি নিয়োজিত হয়েছে। মাওলানা মুফতী উবায়দুল্লাহ তাঁদেরই

একজন। এলেম ও আমলের মাপকাঠিতে গাযালীর (রাহঃ) রচনাবলী অনুবাদ করার মত যোগ্য কর্মী বলেই আমি তাঁকে বিবেচনা করি। আমার আন্তরিক দোয়া, আল্লাহ পাক যেন তাঁর প্রতিভাদীপ্ত যৌবন ইমাম গাযালীর (রাহঃ) রূহানী ফয়যের দ্বারা আরও কর্মোদ্দীপ্ত করে তুলেন।

সমাজের বর্তমান সর্বগ্রাসী অবক্ষয় দৃষ্টে দুর্ভাবনাগ্রস্ত সুধীমণ্ডলীর প্রতি আবেদন, সর্বকালের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক মনীষী ইমাম গাযালীর (রাহঃ) রচনাবলীর মধ্যে তাঁরা বর্তমান সমস্যার সমাধান তালাশ করে দেখতে পারেন। রোগের চিকিৎসা যেমন পরীক্ষিত ঔষধ দ্বারা করতে হয়, তেমনি রুগ্ন সমাজের চিকিৎসাও আত্মার গভীরে বিপ্লব সাধনের মাধ্যমেই কেবল সম্ভব। এক্ষেত্রে গাযালীর শিক্ষা বহু পরীক্ষিত একটি মহৌষধ তাতে সন্দেহ নাই।

আল্লাহপাক আমাদিগকে হক তালাশ করে তা অনুসরণ করার তওফীক দান করুন। আমীন ! !

বিনয়াবনত
মুহিউদ্দীন খান
সম্পাদক ঃ মাসিক মদীনা, ঢাকা
৩১-১২-৮৮

এক নজরে
হুজ্জাতুল-ইসলাম ইমাম গায্যালী (রহঃ)

- নাম ঃ আবূ হামেদ মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ আল-গায্যালী আত্-তূসী। উপাধি ঃ হুজ্জাতুল-ইসলাম, অর্থাৎ ইসলামের যুক্তিঋদ্ধ কণ্ঠ।

- তদানীন্তনকালে ইল্ম ও জ্ঞানচর্চায় সমৃদ্ধ এবং শীর্ষস্থানীয় আলেম-উলামার কেন্দ্রস্থল 'তুস' শহরে ৪৫০ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। একটি সম্ভ্রান্ত, মধ্যবিত্ত, খাঁটি ইসলামী পরিবারে তাঁর শৈশব অতিক্রান্ত হয়।

- তূসে আহমদ বিন মুহাম্মাদ রাযেকানী (রহঃ)-এর নিকট ফেকাহ্শাস্ত্রের কিছু অংশ অধ্যায়ন করেন। অতঃপর জুরজানের ইমাম আবূ নসর ইসমাঈলীর নিকট গমন করেন এবং ফিকাহ্-শাস্ত্রের উপর হযরত ইসমাঈলী প্রদত্ত অধ্যাপনা থেকে সঞ্চিত একটি মূল্যবান নোট প্রস্তুত করে তূসে প্রত্যাবর্তন করেন।

- একটি ইল্মে-দ্বীনান্বেষী কাফেলার সাথী হয়ে তূস হতে নিশাপুর গমন করেন এবং 'ইমামুল-হারামইনের নিকট ইল্ম অর্জনে আত্মনিয়োগ করেন। ইমামুল-হারামাইনের ইন্তেকালের পর তিনি সেখানকার সেনানিবাস এলাকায় অবস্থানরত উযীর নিযামুল-মুলকের সঙ্গে সাক্ষাত করেন। সেখানে বহু যশস্বী পণ্ডিতের সঙ্গে অনুষ্ঠিত

বাহাছে তিনি তাদের পরাজিত করে সুখ্যাতি অর্জন করেন এবং নিযামুল-মুলক তাঁর প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন করেন।

- নিযামুল-মুলকের অনুরোধে ৪৮৪ হিজরীর জুমাদাল-উলায় বাগদাদের 'মাদ্রাসায়ে-নিযামিয়া'য় অধ্যাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

- ৪৮৮ হিজরীর রজব মাসে তাঁর অন্তর্জগতে এক রূহানী বিপ্লব সূচিত হয় এবং সেই যন্ত্রণাকাতর অস্থিরতা ৪৮৯ হিজরীর শুরুভাগ পর্যন্ত দীর্ঘ ছয়মাস কাল অব্যাহত থাকে। এরই ফলশ্রুতিতে তিনি ৪৮৮ হিজরীর যিলকদ মাসে নিযামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনা থেকে অব্যাহতি গ্রহণ করেন এবং দুনিয়ার তামাম সম্পর্কজাল ছিন্ন করে এশ্ক ও মহব্বত, যুহদ ও মা'রিফাতের প্রান্তহীন পথে যাত্রা করেন। স্বীয় ভ্রাতা আহমদ গায্যালীকে নিযামিয়ার অধ্যাপনায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে যিলহজ্জ মাসে প্রকাশ্যতঃ মক্কা গমনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করে মনে মনে প্রথমতঃ সিরিয়া গমনের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন।

- ৪৮৯ হিজরীর প্রথম দিকে দামেশকে প্রবেশ করেন এবং দীর্ঘদিন যাবত মসজিদে দামেশকে পশ্চিম মিনারায় দরজা কপাট বন্ধ করে ই'তেকাফের হালতে কাটান। অতঃপর বায়তুল-মুকাদ্দাসে গমন করেন। সেখানে প্রত্যহ 'ছাখরা' গম্বুজে প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করে দিয়ে কিছু সময় অতিবাহিত করতেন। সেখান থেকে মাকামে-ইবরাহীমের যিয়ারতের জন্য মক্কা শরীফে গমন করেন।

- ৪৮৯ হিজরীর শেষের দিকে দামেশ্‌কে ফিরে আসেন এবং জামে মসজিদের পশ্চিম মিনারায় ই'তেকাফ শুরু করেন। দরজা বন্ধ করে দিয়ে সারাদিন সেখানে কাটাতেন। ৪৯০ হিজরীর যিলকদ পর্যন্ত দামেশ্‌কেই অবস্থানরত ছিলেন।

- অতঃপর তিনি হজ্জের ফরীযাহ্ সম্পাদন ও রওজা শরীফের যিয়ারতে গমন করেন।

- ৪৯০ হিজরীর পঞ্চম মাসান্তে খোরাসান যাওয়ার পথে বাগদাদ পৌছেন। কিন্তু, সেখানে বেশীদিন অবস্থান করেন নাই। নিযামিয়ার অধ্যাপনায়ও যোগদান করেন নাই।

- খোরাসান গমনের পর কিছুকাল তূসে পাঠদান করেন। অতঃপর অধ্যাপনা, বাহাছ সবকিছু ত্যাগ করে ইবাদতে মশগুল হন এবং নির্জনতা ও যিকরের দ্বারা অন্তরের পরিমার্জনকে প্রাধান্য প্রদান করেন। কিন্তু সময়ের বিভিন্ন সংকট, পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণের সমস্যা তাঁর নির্জনতার ঐকান্তিকতা ও মূল লক্ষ্যপথে খানিকটা বিঘ্ন ঘটাতে থাকে। এ অবস্থাতেই সুদীর্ঘ প্রায় নয়টি বৎসর অতিবাহিত হয়।

- ৪৯৮ হিজরীর রবীউস্‌সানী মাসে সান্‌জার-ফখরুল-মুল্‌ক আলী ইবনে নিযামকে খোরাসানে তাঁর উযীর নিযুক্ত করার পর আলী ইবনে নিযাম হযরত গায্যালী (রহঃ)-কে পুনরায় অধ্যাপনাব্রত গ্রহণের জোর আবেদন জানান। তিনি তাঁর প্রত্যয়দীপ্ত এ প্রস্তাব এড়াতে না পেরে নিশাপুরের নিযামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনায় যোগদান করেন (বাগদাদের নিযামিয়ায় নয়)। কারণ, ফখরুল-মুল্‌ক আলী ছিলেন

বাদশাহ্ মুহাম্মদ ইবনে মালিক শাহ-এর নিযুক্ত খোরাসানের গভর্ণর (তাঁরই ভ্রাতা) সান্জার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত নিশাপুরের একজন মন্ত্রী।

- অতঃপর তিনি তাঁর বাড়ীতে ফিরে যান এবং বাড়ীর নিকটেই দ্বীনি শিক্ষার্থীদের জন্য একটি মাদ্রাসা ও রূহানী তরবিয়তপ্রার্থীদের জন্য একটি খানকাহ্ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি তাঁর নিজের ও হাযেরীনের জন্য বিভিন্ন আমলের সময়সূচী নির্ধারিত করে নিয়েছিলেন এবং তাতে অন্তর্ভুক্ত ছিলো ঃ খতমে-কুরআন, আল্লাহওয়ালাদের সান্নিধ্যে উপবেশন, পাঠদান বৈঠক প্রভৃতি। এ রুটিনের উদ্দেশ্য ছিল, যাতে তাঁর বা তাঁর সাথী ও শাগরেদদের কারো একটি মুহূর্তও অনর্থক না কাটে।

- ইল্ম ও আমল তাসনীফ (গ্রন্থনা) ও দাওয়াতের কর্মমুখর পঞ্চান্নটি বছর অতিবাহনের পর হুজ্জাতুল-ইসলাম ইমাম আবূ হামেদ মুহাম্মাদ আল-গায্যালী (রহঃ) জুমাদাল-উখরা ৫০৫ হিজরী মুতাবেক ১৮ ডিসেম্বর ১১১১ ঈসায়ী রোজ সোমবার তুসে ওফাত পান এবং 'ত্বাবরান' নামক স্থানে সমাধিস্থ হন। رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى

সূচীপত্র

* * *

الحمد لله الذى احسن تدبير الكائنات وخلق الارضين
والسموت وانزل الماء من المعصرات وانشأ الحب والنبات
وقدر الارزاق والاقوات واثاب على الاعمال الصالحات و
الصلوة والسلام على سيدنا محمد ذى المعجزات الظاهرات
الذى حصل بنوره وجود الكائنات وبعد :

'সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি সারা জাহানকে সুন্দর ও সুশৃঙ্খল নিয়মে পরিচালনা করছেন। আসমান ও যমীনের সকল স্তর যিনি সৃষ্টি করেছেন। জলধর মেঘমালা হতে যিনি প্রচুর বৃষ্টিপাত করেন। খাদ্য-খাবার, অন্নদানা ও শস্যসমৃদ্ধ বিপুল প্রান্তর যিনি সৃজন করেছেন। প্রত্যেকের প্রাপ্য রিযিক ও সম্ভোগ্য সম্পদ যিনি সুনির্ধারিত করে দিয়েছেন। নেক আমল ও সনিষ্ঠ ইবাদতের প্রতিদানে যিনি সওয়াব ও পুরস্কারের ব্যবস্থা করেছেন।

দরূদ ও সালাম আমাদের মহান পথ-প্রদর্শক মাহ্‌বুব ও মুর্শিদ, অত্যুজ্জ্বল মু'জিযাত ও দেদীপ্যমান নিদর্শনাদির অধিকারী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি, যাঁর নুর ও কল্যাণের তোফায়লে সমগ্র জগত অস্তিত্ব লাভ করেছে।'

অধ্যায় ঃ ১

খওফ ও খাশিয়াত বা খোদাভীতি

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ 'আল্লাহ তা'আলা একজন ফেরেশ্‌তা সৃষ্টি করেছেন, যার বিরাটকায় দেহের এক বাহু দুনিয়ার পূর্ব প্রান্তে এবং অপর বাহু দুনিয়ার পশ্চিম প্রান্তে। মাথা আরশের সন্নিকটে এবং পদদ্বয় যমীনের সপ্তম তবককেও অতিক্রম করেছে। তাকে সমগ্র জগতে বিস্তৃত সৃষ্টির সমপরিমাণ পর-পাখা দেওয়া হয়েছে। আমার উম্মতের মধ্যে কোন পুরুষ বা নারী যখন আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা সেই ফেরেশ্‌তাকে এই মর্মে নির্দেশ প্রদান করেন যে, সে যেন আরশের নীচে অবস্থিত 'নূরের সাগরে' ডুব দেয়। আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ অনুযায়ী সে দরিয়াতে নিমজ্জিত হয়ে বাহির হয় এবং সর্ব শরীর ঝাড়া দেয়। ফলে, তার অসংখ্য পাখনা হতে অগণিত পানি-বিন্দু ঝরে পড়ে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কুদরতের দ্বারা ফেরেশ্‌তার গা থেকে ঝরে পড়া প্রতিটি বিন্দু হতে এক একজন ফেরেশ্‌তা সৃষ্টি করেন। এই অসংখ্য-অগণিত ফেরেশ্‌তা দরূদ পাঠকারী ব্যক্তির জন্য ক্বিয়ামত পর্যন্ত গুনাহ্-মাফীর দো'আ করতে থাকে।'

জনৈক বুযুর্গ বলেছেন ঃ 'দেহের স্বাস্থ্য নির্ভর করে অল্পাহারের উপর, আত্মার শান্তি নির্ভর করে পাপকার্য পরিত্যাগ করার উপর, আর দ্বীন ও ঈমানের সংরক্ষণ নির্ভর করে হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ পাঠের উপর।'

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ

'হে ঈমানদার ব্যক্তিগণ! তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর।'

অর্থাৎ-তোমাদের অন্তরে আল্লাহ্ তা'আলার ভয়-ভীতি জাগরুক করে তোল এবং পরিপূর্ণভাবে তাঁর দাসত্ব ও আনুগত্য অবলম্বন করে নাও।

وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ

'এবং প্রত্যেকের উচিত,—আগামী (ক্বিয়ামত) দিবসের জন্য সে কি (আমল) প্রেরণ করছে, (বা এর জন্য কি প্রস্তুতি নিচ্ছে,) সে বিষয়ে চিন্তা করা।' বস্তুতঃ এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা এই মর্মে নির্দেশ প্রদান করছেন যে, তোমরা দান-খয়রাত ও ইবাদত-বন্দেগীতে আত্মনিয়োগ কর। যাতে এর প্রতিদানে ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র দরবারে পুরস্কৃত হতে পার।

وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝

'তোমরা সর্বদা আল্লাহ্‌কে ভয় করতে থাক। কারণ তিনি তোমাদের (প্রতিটি নেক আমল ও অন্যায়) কার্য-কলাপ সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত।' (হাশর ঃ ১৮)

আদম-সন্তান দুনিয়াতে কি কি সৎকাজ করেছে অথবা কি কি অপরাধ ও অসৎ কাজে লিপ্ত হয়েছে; আল্লাহ্‌র আনুগত্য স্বীকার করেছে, কি নাফরমানী করেছে, সে সম্পর্কে ক্বিয়ামতের দিন ফেরেশতাকুল, আসমান-যমীন, দিবস-রজনী—এ সবকিছু আল্লাহ্‌র সম্মুখে সাক্ষ্য প্রদান করবে। বরং সেদিন মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও মানুষের স্বার্থের বিপরীত সাক্ষ্য দিবে। মানুষ যদি সৎ ও পুণ্যবান হয়, তা'হলে তার স্বপক্ষেই সাক্ষ্য প্রদান করবে। ঈমানদার ও পরহেযগার ব্যক্তির স্বপক্ষে যমীন এই মর্মে সাক্ষ্য দান করবে যে, 'ইয়া আল্লাহ্! এ ব্যক্তি তোমাকে খুশী করার জন্য আমার পৃষ্ঠে নামায পড়েছে, রোযা রেখেছে, হজ্জ করেছে, জিহাদ করেছে।' উক্তরূপ সাক্ষ্য শ্রবণ করে ঈমানদার ব্যক্তি অত্যন্ত আনন্দিত ও পুলকিত হবে। পক্ষান্তরে, যমীন কাফের ও অবাধ্য ব্যক্তির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে যে, 'হে আল্লাহ! এ ব্যক্তি আমার পৃষ্ঠে বিচরণ করে শিরক করেছে, ব্যভিচার করেছে, শরাব পান করেছে এবং অন্যান্য হারাম কার্যে লিপ্ত হয়েছে।' ফলে, রোয হাশরের কঠিন হিসাবের সময় ধ্বংস ও শাস্তি তাকে গ্রাস করে নিবে। বস্তুত ঃ প্রকৃত ঈমানদার সে-ই, যে নিজের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করে এবং সদা শঙ্কিত থাকে।

ফক্বীহ আবুল-লাইস (রহঃ) বলেছেন ঃ 'কারও অন্তঃকরণে আল্লাহ্‌র

ভয়-ভীতি আছে কি-না? এ বিষয়ে তুমি যদি জানতে চাও, তা'হলে সাতটি আলামত ও লক্ষণের প্রতি লক্ষ্য কর। এগুলো যদি কারও আচার-ব্যবহার, ভাব-ভঙ্গি ও জীবনধারায় পরিলক্ষিত হয়, তা' হলে বুঝে নাও যে, তার মনের ভিতরে খোদা-ভীতি ও পরহেযগারী বদ্ধমূল হয়েছে ; তার অন্তর খোদার খওফ ও খাশিয়াতে আবাদ হয়েছে। সেই লক্ষণগুলো হচ্ছে ঃ

এক,-- এ আলামতটি জিহ্বার সাথে সম্পর্কিত। অর্থাৎ,— তার জিহ্বা মিথ্যা, বানোয়াট, গীবত, চুগ্লি, অপবাদ, অপ্রীতিকর কথাবার্তা ও অহেতুক বাক্যালাপ হতে বিরত থাকবে এবং সর্বদা আল্লাহ্র যিকর, কুরআন তিলাওয়াত ও দ্বীনি ইলমের চর্চায় নিমগ্ন থাকবে।

দ্বিতীয় আলামত অন্তরের সাথে সম্পর্কিত। অর্থাৎ,—অন্যের প্রতি শত্রুতা পোষণ করা, অহেতুক কাউকে দোষারোপ করা এবং হিংসা, বিদ্বেষ প্রভৃতি ব্যাধি হতে সে সম্পূর্ণ মুক্ত-পবিত্র থাকবে। হাদীস শরীফে আছে ঃ

اَلْحَسَدُ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ ـ

'হিংসা নেক আমলকে এমনভাবে গ্রাস করে ফেলে, যেমন অগ্নি কাষ্ঠকে জ্বালিয়ে শেষ করে দেয়।'

এ কথা স্মরণ রাখতে হবে এবং সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে যে, হিংসা-বিদ্বেষ মানব হৃদয়ের একটি দুরারোগ্য ব্যাধি। এ ধরণের আরও অসংখ্য ব্যাধি রয়েছে। এগুলো হতে নিস্কৃতি পেতে হলে পরিপক্ক ইলম ও সনিষ্ঠ আমলের একান্ত প্রয়োজন। বস্তুতঃ উক্তরূপ ইলম ও আমলের সমন্বিত সাধনা ও পরিশ্রমের মাধ্যমেই আধ্যাত্মিক ব্যাধিসমূহ থেকে আত্মরক্ষা করা অথবা এসব রোগের সুচিকিৎসা করা সম্ভব হতে পারে।

তৃতীয় আলামত চক্ষু বা দৃষ্টির সাথে সম্পর্কিত। অর্থাৎ,— খোদাভীরু ও পরহেযগার ব্যক্তি স্বীয় দৃষ্টিকে হারাম খাদ্যদ্রব্য, নিষিদ্ধ পানীয় বস্তু, হারাম লেবাস-পোষাক থেকে হিফাযত করবে এবং পার্থিব বস্তুনিচয়ের প্রতি কখনও লোলুপ দৃষ্টি করবে না। বরং আল্লাহর অনুপম সৃষ্টি ও কুদরতের প্রতি দৃষ্টি করে শিক্ষা ও সবক হাসিল করবে। হারাম ও নিষিদ্ধ পদার্থের প্রতি মোটেও ভ্রূক্ষেপ করবে না। হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

مَنْ مَلَأَ عَيْنَهُ مِنَ الْحَرَامِ مَلَأَ اللّٰهُ تَعَالٰى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَيْنَهُ مِنَ النَّارِ ـ

'যে ব্যক্তি নিজের চক্ষুকে হারাম বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাতের দ্বারা পরিতৃপ্ত করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা সেই চক্ষুর ভিতরে দোযখের অগ্নি ভরে দিবেন।'

চতুর্থ আলামত উদরের সাথে সম্পর্কিত। অর্থাৎ,—পরহেযগার ব্যক্তি স্বীয় উদরকে হারাম পন্থায় উপার্জিত রিযিক হতে হিফাযত করবে। কেননা এহেন রিযিক ভক্ষণ করা স্বতঃসিদ্ধ মহাপাপ। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

إِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةٌ مِنَ الْحَرَامِ فِي بَطْنِ ابْنِ اٰدَمَ لَعَنَهُ كُلُّ مَلَكٍ فِي الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ مَا دَامَتْ تِلْكَ اللُّقْمَةُ فِي بَطْنِهِ وَإِنْ مَاتَ عَلٰى تِلْكَ الْحَالَةِ فَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ ـ

'আদম সন্তানের উদরে যখন হারাম খাদ্যের কোন লুকমা পতিত হয়, তখন যমীন ও আসমানের সকল ফেরেশতা তার উপর লা'নত ও অভিশাপ দিতে থাকে— যতক্ষণ পর্যন্ত এই লুকমা তার পেটে মওজুদ থাকে। আর যদি উক্ত লুকমা পেটে থাকা অবস্থায় সে মারা যায়, তা'হলে তার ঠিকানা হয় জাহান্নাম।'

পঞ্চম লক্ষণ হস্তের সাথে সম্পর্কিত। অর্থাৎ,—পরহেযগার ব্যক্তির হাত কখনও হারাম ও নিষিদ্ধ বস্তুর প্রতি প্রসারিত হবে না। বরং সাধ্যানুযায়ী সর্বদা সে স্বীয় হাতকে আল্লাহ্র দাসত্ব ও আনুগত্যের কাজে ব্যবহার করবে।

হযরত কা'ব্ আহবার (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা বেহেশ্তে সবুজ ইয়াকুত রত্নের মহল তৈরী করেছেন, প্রত্যেক মহলে সত্তর হাজার কামরা আছে। আবার প্রত্যেক কামরায় সত্তর হাজার দরজা আছে।

এই বেহেশতে ঐ ব্যক্তিই প্রবেশ করতে পারবে, যার সম্মুখে দুনিয়াতে হারাম বস্তু পেশ করা হয়েছে ; কিন্তু সে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার ভয়ে তা পরিত্যাগ করেছে।'

ষষ্ঠ আলামত পদদ্বয়ের সাথে সম্পর্কিত। অর্থাৎ,— পরহেযগার ব্যক্তির পদদ্বয় আল্লাহ্ তা'আলার না-ফরমানী ও অবাধ্যতার কাজে ব্যবহার হবে না। বরং সর্বদা আল্লাহ্র আনুগত্য ও সন্তুষ্টির কাজে ব্যবহৃত হবে এবং উলামা, মাশায়েখ ও আল্লাহ্র প্রিয় বান্দাদের প্রতি বেগবান হবে।

সপ্তম আলামত ইবাদত ও রিয়াযত। অর্থাৎ,— খালেস ও নেক নিয়তে একমাত্র আল্লাহ্র জন্য ইবাদত-বন্দেগী ও সাধনা-পরিশ্রমে নিমগ্ন থাকবে। বস্তুতঃ মানবের উচিত এটাই যে, সর্ববিধ সাধনা ও ইবাদতের মূলে একমাত্র সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ রাব্বুল-আলামীনের রেযা' ও সন্তুষ্টিকেই সামনে রাখবে ; এতে কোনরূপ রিয়াকারী, লোকদেখানো মনোবৃত্তি ও কপটতাকে প্রশ্রয় দিবে না। এ বিষয়ে সাফল্য অর্জন করতে পারলে সে ঐসব মহান ও ভাগ্যবান লোকের অন্তর্ভুক্ত হবে, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

وَالْاٰخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِيْنَ ۝

'মুত্তাকীদের জন্য রয়েছে তোমার প্রতিপালকের নিকট আখেরাতের কল্যাণ।' (যুখ্রুফ ঃ ৩৫)

অন্যত্র ইরশাদ করেছেন ঃ

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ۝

'মুত্তাকীগণ থাকবে ঝর্ণাবহুল জান্নাতে।' (হিজ্‌র ঃ ৪৫)

আরও ইরশাদ করেছেন ঃ

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّنَعِيْمٍ ۝

'মুত্তাকীগণ থাকবে জান্নাতে ও ভোগ-বিলাসে।' (তূর ঃ ১৭)

আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ مَقَامٍ اَمِيْنٍ ۝

'মুত্তাকীগণ থাকবে নিরাপদ স্থানে।' (দুখান ঃ ৫২)

উপরোক্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা প্রকারান্তরে এ ঘোষণাই করেছেন যে, ক্বিয়ামতের দিবসে দোযখের অগ্নি হতে তাঁরা অবশ্যই মুক্তি পাবে।

ঈমানদার ব্যক্তির উচিত, যেন সে ভয় ও আশার মধ্যবর্তী স্থানে স্থিত থাকে। কেননা, এরূপ ব্যক্তিই কেবল আল্লাহ্ তা'আলার রহমত ও অনুগ্রহের আশা করতে পারে এবং তাঁর নিকট ক্ষমাপ্রাপ্তির বিষয়ে নিরাশ হয় না।

আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ط

'তোমরা আল্লাহ্র অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয়ো না।' (যুমার ঃ ৫৩)

অতএব, তোমার কর্তব্য হচ্ছে—তুমি একান্তভাবে আল্লাহর দাসত্ব ও ইবাদত-বন্দেগীতে মগ্ন হয়ে যাও, সকল অসৎ ও গর্হিত কার্য পরিহার করে এক আল্লাহর প্রতি ধাবিত হও এবং সর্বান্তকরণে ও পরিপূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ কর।

একদা হযরত দাঊদ আলাইহিস সালাম নিজ গৃহে বসে পবিত্র যবূর কিতাব তিলাওয়াত করছিলেন। এমন সময় একটি গর্ত হতে লাল বর্ণের একটি কীট বের হয়। হযরত দাঊদ (আঃ)-এর দৃষ্টি সেই কীটের উপর পতিত হলে তাঁর মনে প্রশ্নের উদ্রেক হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা এই কীটটিকে কি উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন ; এর রহস্য ও তাৎপর্য কি? তখন আল্লাহ্ তা'আলা সেই কীটটিকে বাকশক্তি দান করে নবীর প্রশ্নের জওয়াব দিতে আদেশ করলেন। কীটটি বললো ঃ হে আল্লাহর নবী! আল্লাহ্ তা'আলা আমার অন্তরকে এভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, আমি প্রত্যহ দিবসে এক হাজার বার এই কালেমা পাঠ করি ঃ

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ ـ

এবং প্রত্যহ রাত্রিকালে আমি এই দরূদ শরীফ পড়ে থাকি ঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ۔

হে আল্লাহ্র নবী! এখন বলুন, আপনি আমার সম্পর্কে কি মন্তব্য করছেন ; আমি আপনার দ্বারা উপকৃত হতে চাই। কীটের মুখে একথা শুনে হযরত দাউদ (আঃ) অনুশোচনায় ভেঙ্গে পড়লেন এবং ভীত-শঙ্কিত হয়ে তওবা করে নিজেকে আল্লাহ্র সোপর্দ করলেন।

হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম যখন স্বীয় পদস্খলনের কথা স্মরণ করতেন, তখন সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়তেন এবং দূর হতে তাঁর বুকের ধড়-ফড় আওয়ায শুনা যেতো। এমনি এক অবস্থার সময় একদা আল্লাহ্ তা'আলা হযরত জিবরাঈল (আঃ)-কে প্রেরণ করলেন। তিনি হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামকে বললেন,—মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে সালাম জানিয়েছেন এবং জিজ্ঞাসা করেছেন যে, আপনি কি এমন কোন লোক দেখেছেন, যে তার বন্ধুকে ভয় করে? হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বললেন,—'হে জিব্রাঈল! আমার পদস্খলনের কথা যখন স্মরণ হয়, তখন শেষ পরিণামের কথা চিন্তা করে আমি বিহ্বল হয়ে পড়ি ; আল্লাহর সাথে গভীর বন্ধুত্বের কথা তখন আমার স্মরণ থাকে না।'

প্রিয় সাধক! আল্লাহর একান্ত প্রিয় বান্দা আম্বিয়ায়ে কেরাম, আওলিয়ায়ে সালেহীন ও দুনিয়াত্যাগী যাহেদীনের অবস্থা যদি এই হয়, তা'হলে, অন্যান্যদের দশা কি হবে? চিন্তা করা উচিত এবং এ থেকে প্রচুর শিক্ষা ও সবক হাসিল করা উচিত।

অধ্যায় ঃ ২

খওফ ও খাশিয়াত বা খোদাভীতি

(পূর্ব প্রসঙ্গ)

হযরত আবুল-লাইস (রহঃ) বলেছেন ঃ সপ্তম আসমানে আল্লাহ্ তা'আলা অসংখ্য ফেরেশ্তা সৃষ্টি করে রেখেছেন। সৃষ্টিলগ্ন থেকেই তাঁরা আল্লাহ্ তা'আলার আরাধনায় সিজদারত অবস্থায় মগ্ন রয়েছে এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত এভাবেই থাকবে। আল্লাহ তা'আলার ভয়ে তাঁদের পাঁজর সর্বদা প্রকম্পিত থাকে। ক্বিয়ামতের দিবসে তাঁরা মস্তক উত্তোলনপূর্বক বলবে,—'আয় আল্লাহ! আপনি পাক পবিত্র, আপনার হক আদায় করে যেভাবে ইবাদত করা আমাদের কর্তব্য ছিল তা' আমরা করতে পারি নাই।' যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

يَخَافُوْنَ رَبَّهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ۩ السجدة

'তারা তাদের উপর পরাক্রমশালী তাদের রব্বকে ভয় করে এবং তারা যা আদেশ পায় তা' করে।' (সূরা নাহ্ল, আয়াত ঃ ৫০)

অর্থাৎ,— তারা এক মুহূর্তের জন্যেও আল্লাহ্ তা'আলার ভয়-ভীতি হতে চিন্তামুক্ত হয় না।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

اِذَا اقْشَعَرَّ جَسَدُ الْعَبْدِ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى تَحَاتَّتْ عَنْهُ ذُنُوْبُهٗ كَمَا يَتَحَاتُّ عَنِ الشَّجَرِ وَرَقُهَا۔

'আল্লাহর ভয়ে যখন বান্দার শরীর কম্পমান হয়, তখন তার পাপরাশি এইরূপে ঝরে পড়ে যেমন বৃক্ষ হতে শুষ্ক পত্র ঝরে পড়ে।'

একদা এক ব্যক্তি জনৈকা নারীর প্রতি প্রেমাসক্ত হয়। কোন প্রয়োজনে

সেই মহিলা গৃহ হতে বের হলে প্রেমিক তার পশ্চাদানুসরণ করতে থাকে। এভাবে এক বনভূমিতে দু'জন একত্রিত হয়। আশেপাশের লোকজন নিদ্রাভিভূত হওয়ার পর একান্ত মুহূর্তে পুরুষ উক্ত মহিলার নিকট তার মনোস্কামনা ব্যক্ত করে । তখন মহিলা তাকে জিজ্ঞাসা করলো,—'সকলেই কি ঘুমিয়ে গেছে?' প্রশ্ন শুনে মহিলার সম্মতি অনুমান করে লোকটি কাফেলার চতুর্পাশ প্রদক্ষিণ করে জানালো,— 'সকলেই ঘুমিয়ে গেছে ; কেউ সজাগ নাই।' অতঃপর মহিলা তাকে জিজ্ঞাসা করলো,—'মহান আল্লাহ্ তা'আলা সম্পর্কে তোমার কি ধারণা ; তিনিও কি এ সময় ঘুমিয়ে আছেন?' লোকটি বললো,—'আল্লাহ্ তা'আলা ঘুমান না ; নিদ্রা বা তন্দ্রা তাঁকে স্পর্শ করে না।' মহিলা বললো,—'যে সত্তা ঘুমান নাই এবং যিনি কখনও ঘুমাবেন না, সর্বদা সজাগ ও চিরঞ্জীব সেই সত্তা আমাদেরকে দেখছেন ; যদিও অন্যান্য লোকজনের কেউ আমাদেরকে দেখছে না। সুতরাং এমতাবস্থায় আমাদের অধিকতর ভীত-শঙ্কিত হওয়া উচিত।' মহিলার এ বক্তব্য শুনে লোকটির অন্তরে আল্লাহ্র ভয় সঞ্চারিত হলো এবং তৎক্ষণাৎ সত্যিকার তওবা করে সে উক্ত গর্হিত কাজ পরিত্যাগ করলো। কিছুকাল পর সে মারা গেলে এক ব্যক্তি স্বপ্নযোগে তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, আল্লাহ্ তা'আলা আপনার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করেছেন? উত্তরে সে বলেছে ঃ 'আল্লাহর ভয়ে আমি পাপকার্য হতে বিরত হওয়ার কারণে তিনি আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।'

বনী ইসরাঈল গোত্রে একজন আবেদ লোক ছিলেন। পরিবার-পরিজন নিয়ে দারিদ্র্য অবস্থায় জীবন-যাপন করতেন। একদা জঠর জ্বালায় অস্থির হয়ে সন্তানদের জন্য কিছু খাবারের ব্যবস্থা করার উদ্দেশে তিনি স্ত্রীকে বাহিরে পাঠালেন। স্ত্রী জনৈক ধনাঢ্য ব্যক্তির দারস্থ হয়ে সন্তানদের জন্য কিছু প্রার্থনা করলে লোকটি বললো,—'অবশ্যই আমি তোমাকে কিছু দান করবো ; কিন্তু শর্ত হচ্ছে আমি কিছুক্ষণের জন্য তোমাকে ভোগ করতে চাই।' একথা শুনে স্ত্রীলোকটি নিশ্চুপ গৃহে ফিরে আসলো। গৃহে এসে দেখে সন্তানরা ক্ষুধার যন্ত্রণায় কান্নাকাটি করছে এবং মরণাপন্ন অবস্থায় উপনীত হয়েছে। মা'কে দেখে ওরা তার কাছে খাবারের জন্য আর্তি করতে লাগলো। স্ত্রীলোকটি সন্তানদের এহেন কষ্ট সহ্য করতে না পেরে পুনরায় সেই লোকটির দারস্থ হয়ে প্রার্থনার পুনরাবৃত্তি করলো। স্ত্রীলোকটি প্রথমবারের বিপরীত

এবার দেহ দানের জন্য রাজী হয়ে গেল। অতঃপর ধনাঢ্য লোকটি স্বীয় মনোস্কামনা পূরণের জন্য যখন উদ্যত হলো, তখন স্ত্রীলোকটির সর্বশরীর হঠাৎ এমনভাবে কাঁপতে আরম্ভ করলো যে, তার শরীরের জোড় গ্রন্থিসমূহ যেন উপ্‌ড়ে যাবে। লোকটি জিজ্ঞাসা করলো,—'তোমার এ অবস্থা হচ্ছে কেন?' স্ত্রীলোকটি বললো,—'আমি মহান সৃষ্টিকর্তাকে ভয় করি, ফলে আমার এ অবস্থা হয়েছে।' লোকটি বললো,—'তোমার এহেন ভুখা-ফাকা ও দারিদ্রাবস্থায়ও আল্লাহ্র প্রতি তুমি এত প্রবল ভীতি ও শঙ্কা বোধ করছো! তা'হলে তো আমার পক্ষে আল্লাহ্কে আরও অধিক ভয় করা উচিত।' এ কথা বলে সে উক্ত গর্হিত কাজ হতে বিরত হয়ে গেল এবং স্বচ্ছ অন্তরে মহিলাকে তার প্রয়োজনের চাইতেও অধিক মাল-সম্পদ দিয়ে বিদায় করলো। মহিলা ঘরে ফিরে পরিবার-পরিজনকে নিয়ে আনন্দচিত্তে সকলের জঠর-জ্বালা নিবারণ করলো।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আঃ)-এর নিকট এই মর্মে ওহী প্রেরণ করলেন যে, 'হে মূসা! তুমি আমার সেই ধনাঢ্য বান্দাকে সুসংবাদ শুনিয়ে দাও যে, আমি তার সমস্ত গুনাহ্ মাফ করে দিয়েছি।' অতঃপর হযরত মূসা (আঃ) সেই বান্দার নিকট গমন করে বললেন, —'তুমি এমন কি সৎকাজ করেছো? যার ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তোমার সমস্ত গুনাহ্ মাফ করে দিয়েছেন?' লোকটি হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে পূর্বাপর সম্পূর্ণ ঘটনা শুনালো। অতঃপর হযরত মূসা (আঃ) তাকে ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত সুসংবাদটি শুনিয়ে বিদায় নিলেন।

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,— মহামহিমান্বিত আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

لَا اَجْمَعُ عَلٰى عَبْدِىْ خَوْفَيْنِ وَ لَا اَمْنَيْنِ - مَنْ خَافَنِىْ فِى الدُّنْيَا اَمِنْتُهٗ فِى الْاٰخِرَةِ وَمَنْ اَمِنَنِىْ فِى الدُّنْيَا اَخَفْتُهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

'আমি কখনও স্বীয় বান্দার মধ্যে দুইটি ভয় এবং দুইটি অভয় একত্রিত

করি না। যে-বান্দা ইহজগতে আমার ভয়ে থাকবে, পরকালে আমি তাকে নির্ভয় রাখবো। আর যে-ব্যক্তি ইহলোকে আমা হতে নির্ভয় থাকবে, পরলোকে আমি তাকে ভীত-সন্ত্রস্ত রাখবো।'

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ ۝

'তোমরা লোকদেরকে ভয় করো না ; ভয় আমাকেই কর।'

(মায়িদাহ্ ঃ ৪৪)

তিনি আরও ইরশাদ করেন ঃ

فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝

'তোমরা তাদেরকে ভয় করো না ; ভয় আমাকেই কর, যদি তোমরা প্রকৃত ঈমানদার হয়ে থাক।' (আলি-ইম্‌রান ঃ ১৭৫)

আমীরুল-মুমেনীন হযরত উমর ফারুক (রাযিঃ) আল্লাহর ভয়ে মাটিতে ঢলে পড়তেন। তিনি কুরআনের কোন আয়াত শ্রবণ করলে মূর্ছিত হয়ে যেতেন। একদা একটি খড়কুটা হাতে নিয়ে তিনি বললেন,—'হায়! আমি যদি এই খড়কুটাটিই হতাম ; আমাকে যদি কেউই উল্লেখ না করতো।' তিনি প্রায়ই আক্ষেপ করে বলতেন ঃ 'হায়! কতই না ভাল হতো, যদি উমর মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠই না হতো।' আল্লাহ্ তা'আলার ভয়ে তিনি এত অধিক পরিমাণে ক্রন্দন করতেন যে, অবিরাম ধারায় অশ্রু প্রবাহিত হওয়ার কারণে তাঁর গণ্ডদ্বয়ের উপর দু'টি কৃষ্ণবর্ণ রেখা পড়ে গিয়েছিল।

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

لَا يَلِجُ النَّارَ مَنْ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ حَتّٰى يَعُوْدَ اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ ـ

'আল্লাহ্র ভয়ে যে-ব্যক্তি রোদন করে, সে দোযখে প্রবেশ করবে না, যেমন স্তন হতে নির্গত দুগ্ধ পুনরায় স্তনে প্রবেশ করে না।'

'রাক্বায়েকুল-আখ্‌বার' কিতাবে আছে ঃ ক্বিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে

আল্লাহর দরবারে উপস্থিত করা হবে। প্রচুর পাপের কারণে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার হুকুম দেওয়া হবে। এমন সময় তার চোখের একটি পশম কথা বলবে এবং আরজ করবে ঃ 'হে পরওয়ারদিগার! আপনার প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

مَنْ بَكٰى مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ حَرَّمَ اللّٰهُ تِلْكَ الْعَيْنَ عَلَى النَّارِ ـ

('যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার ভয়ে ভীত হয়ে ক্রন্দন করবে, সেই ব্যক্তির চক্ষুর জন্য আল্লাহ্ তা'আলা দোযখের আগুন হারাম করে দিয়েছেন।')

আর আমি আপনার ভয়ে ভীত হয়ে ক্রন্দন করেছি। অতএব আমি আপনার নিকট দোযখের অগ্নি হতে মুক্তি প্রার্থনা করি।' অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এই পশমকে মুক্তি দিবেন এবং এই একটি পশমের ওসীলায় সেই বান্দাকেও দোযখের অগ্নি থেকে মুক্তি দান করবেন। তারপর হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ) উচ্চস্বরে ঘোষণা করে দিবেন যে,—'অমুক বান্দাকে শুধুমাত্র একটি পশমের ওসীলায় দোযখের আগুন থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে।'

'বিদায়াতুল-হিদায়াহ্' কিতাবে আছে ঃ ক্বিয়ামতের দিন জাহান্নামকে সকলের সম্মুখে উপস্থিত করা হবে। তখন ভয় ও আতঙ্কের আতিশয্যে হাশরের ময়দানে উপস্থিত সকলেই হাঁটু গেড়ে ভূতলে আছড়িয়ে পড়বে। যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَتَرٰى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً قف كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعٰى إِلٰى كِتَابِهَا ط
الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝

'আপনি প্রত্যেক উম্মতকে দেখবেন নতজানু অবস্থায়। প্রত্যেক উম্মতকে তাদের আমলনামা দেখতে বলা হবে। তোমরা যা' করতে অদ্য তোমাদেরকে তার প্রতিফল দেওয়া হবে।' (জাসিয়াহ্ ঃ ২৮)

জাহান্নামকে উপস্থিত করা হলে সমবেত সকলেই জাহান্নামের ক্রুদ্ধ গর্জন ও হুংকার শুনবে। এ হুংকার ও গর্জন পাঁচশত বৎসরের পথ পরিমাণ দূরত্ব হতেও শ্রুত হবে। এহেন ভয়াবহ অবস্থায় প্রত্যেকেই এমনকি আম্বিয়ায়ে কেরাম পর্যন্ত কেবল নিজের চিন্তায় ব্যস্ত থাকবেন এবং 'নাফ্‌সী নাফ্‌সী'

বলে উদ্বেগ করবেন। একমাত্র প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের জন্য চিন্তা করবেন এবং 'উম্মতী উম্মতী' বলে বেকারার থাকবেন। এ সময় জাহান্নাম থেকে পর্বতসম উঁচু হয়ে অগ্নিশিখা বের হতে থাকবে। উম্মতে মুহাম্মদী এই ভয়াবহ অবস্থা দূর করার জন্য প্রয়াস চালাবে এবং এই বলে দো'আ করবে,—'হে অগ্নি! নামাযী ব্যক্তিদের ওসীলায়, দান-খয়রাতকারীগণের তোফায়লে, নিষ্ঠাবান ও রোযাদার লোকদের দোহাই—তুমি তোমার এই ভয়াবহতা নিয়ে আমাদের থেকে দূরে সরে যাও।' এদিকে হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ) সজোরে চিৎকার করে বলে উঠবেন ঃ 'ওই যে সেই ভয়াবহ অগ্নি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের দিকে অগ্রসর হচ্ছে।' একথা বলে হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ) পানি-ভর্তি একটি পাত্র এনে হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হস্ত মুবারকে দিয়ে বলবেন,—এই নিন পানির পেয়ালা ; এই পানি আপনি দোযখের অগ্নির উপর ছিটিয়ে দিন।' হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তৎক্ষণাৎ সেই পানি দোযখের অগ্নির উপর ছিটিয়ে দিবেন। ফলে, সেই ভয়াবহ অগ্নি মুহূর্তের মধ্যে নির্বাপিত হয়ে যাবে। অতঃপর আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ)-কে জিজ্ঞাসা করবেন,—'হে জিব্‌রাঈল! বলুন, এটা কিসের পানি?' হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ) জওয়াবে বলবেন ঃ 'এটা আপনার উম্মতের মধ্যে গুনাহ্‌গার লোকদের অশ্রুজল, যা খোদার ভয়ে রোদন করার কারণে তাদের চোখ হতে নির্গত হয়েছে ; অদ্যকার এ ভয়াবহ পরিস্থিতিতে দোযখের অগ্নি নিবারণের জন্য এ পানি আপনাকে দিতে আমাকে হুকুম করা হয়েছে এবং গোনাহ্‌গার লোকদের এই আঁখিজলের ওসীলায়ই আল্লাহ্‌ তা'আলা দোযখের ভয়াবহ অগ্নিকে নির্বাপিত করে দিয়েছেন।'

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা আল্লাহ্‌র দরবারে এই বলে দো'আ করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِىْ عَيْنَيْنِ تَبْكِيَانِ مِنْ خَشْيَتِكَ قَبْلَ اَنْ يَكُوْنَ الدَّمْعُ دَمًا۔

'হে আল্লাহ্‌! আপনি আমাকে দু'টি ক্রন্দসী চক্ষু দান করুন, যে দু'টির দ্বারা আমি আপনার ভয়ে রোদন করতে পারি—সেই (হাশরের) দিন উপস্থিত হওয়ার পূর্বেই, যেদিন (স্বীয় পাপের কারণে) রক্তের অশ্রু কাঁদতে হবে (তবুও কোনও কাজ হবে না।)।

জনৈক কবি বলেছেন ঃ

اَعَيْنَىَّ هَلَّا تَبْكِيَانِ عَلٰى ذَنْبِىْ

تَنَاثَرَ عُمْرِىْ مِنْ يَدِىْ وَلَا اَدْرِىْ

'ওহে চক্ষুযুগল! আমার কৃত পাপকার্যের উপর তোমরা রোদন কর না কেন? আফ্‌সুস! জীবনের মুহূর্তগুলো গাফলত ও শৈথিল্যের মধ্য দিয়েই শেষ হয়ে গেল ; অথচ আমি তা' টেরও করতে পারলাম না।'

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ 'কোন বান্দার চক্ষু হ'তে আল্লাহ্‌র ভয়ে যদি অন্ততঃপক্ষে মক্ষিকার মস্তক পরিমাণ অশ্রু নির্গত হয়ে তার মুখমণ্ডলকে উষ্ণ করে, তা'হলে তার জন্য দোযখের অগ্নি হারাম হয়ে যাবে।'

হযরত মুহাম্মদ ইবনে মুন্‌যির (রহঃ) যখন আল্লাহ্‌র ভয়ে রোদন করতেন, তখন নির্গত অশ্রু স্বীয় মুখমণ্ডল ও দাড়িতে মর্দন করে বলতেন,—'এই অশ্রুজল যে-যে স্থানে পৌঁছবে, সেসব স্থানকে দোযখের অগ্নি স্পর্শ করবে না।' অতএব প্রত্যেক ঈমানদার ব্যক্তির কর্তব্য,—আল্লাহ্‌র ভয়াবহ আযাব ও শাস্তির কথা স্মরণ করে ভীত-সন্ত্রস্ত হওয়া এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে নিজেকে সর্বদা নিবৃত্ত রাখা।

আল্লাহ্‌ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

فَاَمَّا مَنْ طَغٰى ۙ وَاٰثَرَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۙ فَاِنَّ الْجَحِيْمَ هِىَ الْمَاْوٰى ۗ وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى ۙ فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِىَ الْمَاْوٰى ۗ

'যে ব্যক্তি সীমা লংঘন করে এবং পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দেয়, তার ঠিকানা জাহান্নাম। আর যে ব্যক্তি তার পরওয়ারদিগারের সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করে এবং স্বেচ্ছাচারিতা হতে নিজেকে নিবৃত্ত রাখে, তার ঠিকানা জান্নাত।' (নাযি'আত ঃ ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০)

আল্লাহ্ তা'আলার আযাব হ'তে আত্মরক্ষা করতে হলে এবং তাঁর দয়া ও অনুগ্রহ লাভ করতে হলে, দুনিয়ার জীবনে দুঃখ-কষ্ট ও মুসীবতের উপর ধৈর্যধারণ করতে হবে। সেইসঙ্গে সর্ববিধ পাপাচার পরিহার করে এক আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত ও আনুগত্যে আত্মনিয়োগ করতে হবে।

'যাহ্‌রুর-রিয়াদ' কিতাবে আছে, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ 'যখন বেহেশ্‌তী লোকদেরকে বেহেশ্‌তে স্থান দেওয়া হবে, তখন ফেরেশ্‌তাগণ সর্বপ্রকার বেহেশ্‌তী নেয়ামত ও সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে তাঁদের সাদর-সম্ভাষণ ও আপ্যায়ন করবে, তাঁদের জন্য মঞ্চ স্থাপন করবে এবং রকমারী খাদ্য-সামগ্রী ও ফলমূল পেশ করবে। এসব আয়োজন ও ব্যবস্থাপনা প্রত্যক্ষ করে বেহেশ্‌তীগণ হতবাক ও আশ্চর্যান্বিত হবে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন ঃ 'হে আমার বান্দাগণ! তোমরা আশ্চর্যান্বিত হচ্ছো কেন? আমার এই বেহেশ্‌ত কোনরূপ দুঃখ-ক্লেশ ও বিড়ম্বনার স্থান নয়।' বেহেশ্‌তবাসীরা আরজ করবে,—'হে পরওয়ারদিগার! আমাদের সাথে আপনার একটি ওয়াদা ছিল, সেটা পূরণ হওয়ার সময় এসে গেছে।' তখন আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশ্‌তাদেরকে হুকুম করবেন যে, তোমরা বেহেশ্‌তবাসীদের সম্মুখ হতে পর্দা সরিয়ে নাও, কেননা এঁরা দুনিয়াতে আমাকে স্মরণ করেছে, আমার যিক্‌র করেছে, আমাকে সিজদা করেছে এবং আমার সঙ্গে সাক্ষাত ও দীদারের আকাংখা পোষণ করেছে। আল্লাহ্ পাকের নির্দেশে ফেরেশতাগণ যখন পর্দা সরিয়ে নিবে, তখন বেহেশতবাসীরা স্বচক্ষে আল্লাহ্ তা'আলাকে প্রত্যক্ষ করবে এবং তাঁর সম্মুখে সিজদায় পড়ে যাবে। এ সময় আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে সিজদা হতে মাথা উঠাতে হুকুম করে বলবেন যে, এটা আমল ও ইবাদতের স্থান নয় ; এটা ভোগ-বিলাস ও পুরস্কার-প্রতিদানের স্থান। এরপর থেকে তারা আল্লাহ্ তা'আলার দীদার স্বাভাবিকভাবেই লাভ করতে সমর্থ হবে। অধিকন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাদের আনন্দবৃদ্ধির জন্য বলবেন,—'হে আমার প্রিয় বান্দাগণ! তোমাদের উপর

সালাম ও শান্তি বর্ষিত হোক, আমি তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট, তোমরাও আমার প্রতি সন্তুষ্ট থাক।' বেহেশতবাসীগণ বলবে,—'আমরা আপনার প্রতি অবশ্যই সন্তুষ্ট ; কারণ আপনি আমাদেরকে এমন নেয়ামত দান করেছেন, যা কেউ কোনদিন দেখে নাই, শুনে নাই এবং কল্পনাও করতে পারে নাই। যেমন আল্লাহ তা'আলা এ মর্মে ঘোষণা করেছেন ঃ

رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ؕ

'আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তুষ্ট।'
(বাইয়িনাহ ঃ ৮)

سَلٰمٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ ۝

'করুণাময় পালনকর্তার পক্ষ হতে তাদেরকে বলা হবে 'সালাম'।'
(ইয়াসীন ঃ ৫৮)

অধ্যায় ঃ ৩

রোগ-শোক ও ধৈর্য-সহ্য

আখেরাতের জীবনে আল্লাহ্ তা'আলার আযাব ও গজব হতে যে ব্যক্তি বাঁচতে চায়, আল্লাহ্ তা'আলার রহমত ও অনুগ্রহপ্রাপ্তির যে ব্যক্তি অন্তরে আশা পোষণ করে এবং যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে আগ্রহী-অনুরাগী, তার কর্তব্য হলো— দুনিয়ার লোভ-লালসা ও প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা হতে নিজেকে সংযত করতে হবে, দুঃখ-কষ্ট, রোগ-শোক ও আপদ-বিপদে ধৈর্যধারণ করতে হবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصَّابِرِيْنَ ٥

'আল্লাহ্ তা'আলা ছবরকারীদের ভালবাসেন।'

ছবর বা ধৈর্য চার প্রকারে বিভক্ত। যথা ঃ এক,— আল্লাহ কর্তৃক ফরযকৃত ইবাদতসমূহ সমাধা করার ব্যাপারে ছবর করা। দুই,— আল্লাহ কর্তৃক নিষিদ্ধ কাজ হতে বিরত থাকার ব্যাপারে ছবর করা। তিন,— দুঃখ-দৈন্য ও বিপদ-আপদে ছবর করা। চার,— কোন মুসীবতে পতিত হওয়ার অব্যবহিত পর প্রথম অর্ন্তজ্বালার মুহূর্তেই ছবর করা।

যে ব্যক্তি আল্লাহ্র ইবাদত ও ফরয কার্য সমাধা করার ব্যাপারে ছবর করবে, ক্বিয়ামাতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা তাকে তিনশত গুণ মর্যাদা দান করবেন। প্রত্যেক মর্যাদার মধ্যবর্তী ব্যবধান হবে আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী দূরত্বের সমান। অনুরূপ, যে ব্যক্তি নিষিদ্ধ কাজ হতে বিরত থাকার ব্যাপারে ধৈর্যধারণ করবে, তাকে আল্লাহ্ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন ছয়শত গুণ মর্যাদা দান করবেন। প্রত্যেক মর্যাদার মধ্যবর্তী ব্যবধান হবে সপ্তম আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী দূরত্বের সমান। এমনিভাবে যে ব্যক্তি মুসীবতে ধৈর্যধারণ করবে, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা তাকে সাতশত গুণ মর্যাদা দান করবেন। প্রত্যেক মর্যাদার মধ্যবর্তী দূরত্ব হবে আরশ থেকে ভূগর্ভের (যমীনের

সর্বনিম্ন সপ্তম তবকের) নীচ পর্যন্ত দূরত্বের সমান।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى: مَا مِنْ عَبْدٍ نَزَلَتْ بِهٖ بَلِيَّةٌ فَاعْتَصَمَ بِيْ اِلَّا اَعْطَيْتُهٗ قَبْلَ اَنْ يَسْئَلَنِيْ وَاسْتَجَبْتُ لَهٗ قَبْلَ اَنْ يَدْعُوَنِيْ، وَمَا مِنْ عَبْدٍ نَزَلَتْ بِهٖ بَلِيَّةٌ فَاعْتَصَمَ بِمَخْلُوْقٍ دُوْنِيْ اِلَّا اَغْلَقْتُ اَبْوَابَ السَّمَاءِ عَلَيْهِ۔

'আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ 'কোন বান্দা মুসীবতে পতিত হওয়ার পর যদি একমাত্র আমারই উপর ভরসা করে এবং আমার প্রতি আনুগত্য সহকারে দৃঢ় পদ থাকে, তা'হলে আমার কাছে প্রার্থনা করার পূর্বেই আমি তার মনোবাঞ্ছা পূরণ করি। পক্ষান্তরে যদি সে আমাকে উপেক্ষা করে কোন মাখলুকের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে, তা'হলে আমি তার জন্য আসমানের দরজা (সাহায্য) বন্ধ করে দিই।'

অতএব, সত্যিকার জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় হলো—আপদ-বিপদে, দুঃখ-দৈন্যে ধৈর্যধারণ করা ; এ ব্যাপারে কোনরূপ অভিযোগ উত্থাপন না করা। তা'হলেই দুনিয়া ও আখেরাতের কঠিন শাস্তি থেকে নিস্কৃতি পাওয়া সম্ভব হবে। প্রণিধানযোগ্য যে, আম্বিয়ায়ে কেরাম ও আউলিয়া-বুযুর্গানকে সর্বাধিক দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে।

হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রহঃ) বলেন ঃ 'দুঃখ-দৈন্য ও আপদ-বিপদ হচ্ছে খোদা প্রেমিকের জন্য মশালস্বরূপ, ধর্মপথে বিচরণকারীর জন্য চেতনাবর্দ্ধক, মুমিনের জন্য সংশোধনকারী এবং উদাসীন ও গাফেলের জন্য ধ্বংসের উপকরণ।' বস্তুতঃ ঈমানের প্রকৃত স্বাদ উপলব্ধি করতে হলে আপদে-বিপদে ধৈর্যধারণ করতে হবে ; আল্লাহ্র প্রতি সর্বান্তকরণে সন্তুষ্টির পরিচয় দিতে হবে। হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

مَنْ مَرِضَ لَيْلَةً فَصَبَرَ وَرَضِيَ عَنِ اللّٰهِ تَعَالٰى خَرَجَ مِنْ

ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ فَإِذَا مَرِضْتُمْ فَلَا تَتَمَنَّوُا الْعَافِيَةَ -

'যে ব্যক্তি অসুস্থ অবস্থায় ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সাথে একটি রাত্র অতিবাহিত করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে সদ্যপ্রসূত শিশুর ন্যায় নিষ্পাপ করে দিবেন। সুতরাং রোগাক্রান্ত হলেই রোগমুক্তির জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে যেয়ো না।'

হযরত যাহ্হাক (রহঃ) বলেন ঃ 'অন্ততঃ চল্লিশ দিনে একবার আপদ-বিপদ বা দুঃখ-কষ্টে পতিত না হলে কি করে তুমি আল্লাহ্র কাছে দয়া ও রহমতের আশা করতে পার?'

হযরত মু'আয ইব্নে জাবাল (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ 'আল্লাহ্ তা'আলা যখন কোন বান্দাকে রোগাক্রান্ত করেন, তখন বাম কাঁধের ফেরেশ্তাদেরকে তার পাপরাশি লিপিবদ্ধ করতে নিষেধ করে দেন এবং ডান কাঁধের ফেরেশ্তাদেরকে এই মর্মে নির্দেশ প্রদান করেন যে, এই অসুস্থ ব্যক্তি সুস্থ অবস্থায় যেসব ইবাদত ও নেক আমল করতে সক্ষম ছিল, তার আমলনামায় সেগুলোর সওয়াব লিপিবদ্ধ করতে থাক।'

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ 'যখন কোন বান্দা অসুস্থ হয়, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তার নিকট দুইজন ফেরেশতা প্রেরণ করেন এবং তাঁদেরকে এই মর্মে নির্দেশ প্রদান করেন যে, আমার এই বান্দা কি আমল করে, তা তোমরা লক্ষ্য কর। অসুস্থ বান্দা যদি আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তা'হলে ফেরেশ্তাগণ বান্দার এই গুণকীর্তন আল্লাহ্র দরবারে পেশ করে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ উক্ত বান্দার আমার উপর হক ও প্রাপ্য সাব্যস্ত হয়ে গেছে ; সুতরাং আমি যদি এই পীড়িতাবস্থায় তাকে মৃত্যু দান করি, তা'হলে অবশ্যই তাকে জান্নাত দিবো। আর যদি রোগ হতে মুক্তি দান করি, তা'হলে তার স্বাস্থ্য, শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, মাংসপেশী ও রক্ত প্রবাহ পূর্বের চাইতে আরও উন্নততর করে দিবো এবং সেইসঙ্গে তার সমুদয় গুণাহ্ মাফ করে দিবো।'

বনী ইসরাঈল গোত্রে জনৈক ভবঘুরে ও লম্পট লোক ছিল। বিভিন্ন

ধরনের গর্হিত কাজে সে লিপ্ত থাকতো। নগরবাসীর বহু চেষ্টাও তার কোন প্রকার সংশোধন করতে পারে নাই। অবশেষে অতিষ্ঠ হয়ে সকলেই আল্লাহ্র দরবারে তার কদর্যতা হতে মুক্তি পাওয়ার জন্য কায়মনোবাক্যে মুনাজাত করলো। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদের দো'আ কবুল করে হযরত মূসা আলাইহিস সালামের নিকট ওহী পাঠালেন ঃ 'হে মূসা! বনী ইসরাঈল গোত্রে একজন ভণ্ড যুবক আছে, তাকে শহর হতে বহিস্কার করে দাও, যাতে শুধুমাত্র এক ব্যক্তির পাপের কারণে সমগ্র নগরবাসীর উপর আমার গযব নাযিল না হয়। হযরত মূসা আলাইহিস সালাম আল্লাহ্র নির্দেশ অনুযায়ী তাকে বহিস্কার করে দিলেন। কিন্তু সেই যুবক শহর হতে বহিস্কৃত হয়ে পার্শ্ববর্তী অপর এক বস্তিতে আশ্রয় গ্রহণ করে। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা আলাইহিস সালামের নিকট পুনরায় ওহী পাঠিয়ে তাকে সেখান থেকেও বহিস্কার করার নির্দেশ দিলেন। হযরত মূসা (আঃ) তাই করলেন। অবশেষে লোকটি এক নির্জন প্রান্তরে গিয়ে আশ্রয় নিলো। যেখানে মানুষ বা পশুপক্ষী এমনকি তরুলতা বলতে কিছুই ছিল না। পরবর্তী এক পর্যায়ে লোকটি সেখানে মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে। এহেন অসহায় অবস্থায় তার পার্শ্বে সাহায্যকারী বলতে কেউ ছিল না। এই করুণ অবস্থায় সে ভূলুণ্ঠিত হয়ে মাটির উপর মাথা রেখে বারবার বলছিল ঃ 'হায়! আজকে যদি আমার মা আমার কাছে থাকতেন, তা'হলে তিনি আমার দুঃখে দুঃখিতা হতেন, আমার সেবা-শুশ্রূষা করতেন, মায়া-মহব্বত করতেন, আমার জন্য নয়ন সিক্ত করে রোদন করতেন। হায়! আজকে যদি আমার পিতা কাছে থাকতেন, তা'হলে তিনি আমার সাহায্য-সহযোগিতা করতেন। হায়! যদি আমার স্ত্রী পার্শ্বে থাকতো, তা'হলে সে আমার দুঃখে ক্রন্দন করতো। হায়! যদি আমার সন্তান-সন্ততি এখানে থাকতো, তা'হলে তারা আমার মৃতদেহের পার্শ্বে বসে কান্নাকাটি করতো আর বলতো,—হে আল্লাহ্! আমাদের প্রবাসী পিতাকে তুমি ক্ষমা করে দাও, তিনি অসহায় দুর্বল, তোমার না-ফরমান, অবাধ্য ও স্বেচ্ছাচারী ; লোকেরা তাকে শহর থেকে বস্তিতে বের করে দিয়েছে, পুনরায় তাকে বস্তি থেকে বিজন প্রান্তরে বহিস্কার করেছে ; আর আজকে তিনি ইহকালের এই বিজন ভূমি থেকে পরকালের পথে চিরবিদায় গ্রহণ করছেন, সবকিছু থেকে তিনি নিরাশ ও বঞ্চিত হয়ে একমাত্র তোমার পানে

রওয়ানা হচ্ছেন। আয় আল্লাহ! আপনি আমাকে আমার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রী থেকে সুদূর প্রান্তরে নিক্ষেপ করেছেন, জীবনের এই করুণ মুহূর্তে দয়া করে আমাকে আপনার রহমত ও করুণা থেকে চিরবঞ্চিত করবেন না। তাদের বিচ্ছেদে আপনি আমার অন্তর দগ্ধীভূত করেছেন, মেহেরবানী করে আমার পাপরাশির কারণে আমাকে দোযখের অগ্নিতে দগ্ধীভূত করবেন না।'

লোকটির এই করুণ আর্তনাদ আল্লাহ্‌র দরবারে কবুল হলো। তার স্ত্রী ও মা'র আকৃতি দিয়ে দু'জন হুর, সন্তান-সন্ততির আকৃতি দিয়ে জান্নাতের কয়েকজন শিশু-কিশোর এবং পিতার আকৃতি দিয়ে একজন ফেরেশ্‌তা পাঠিয়ে দিলেন। তারা সকলেই লোকটির পার্শ্বে বসে ক্রন্দন করতে লাগলো। এভাবে সকলের উপস্থিতিতে সে আনন্দচিত্তে আল্লাহ্‌র সাথে মিলিত হয় এবং আল্লাহ্‌ পাক তার সমস্ত গুনাহ্‌ মাফ করে দেন। এভাবে সম্পূর্ণ পবিত্র হয়ে সে দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়।

অতঃপর আল্লাহ্‌ তা'আলা হযরত মূসা (আঃ)-এর নিকট ওহী পাঠালেন ঃ 'হে মূসা! তুমি অমুক বিজন প্রান্তরে গিয়ে দেখ, আমার এক প্রিয় বান্দার ইন্‌তিকাল হয়েছে, তুমি তার কাফন-দাফনের ব্যবস্থা কর। আল্লাহ্‌র হুকুম অনুসারে হযরত মূসা আলাইহিস্‌ সালাম তথায় গিয়ে সে যুবকটিকেই দেখলেন, যাকে তিনি ইতিপূর্বে আল্লাহ্‌র হুকুমে শহর থেকে বস্তিতে আবার বস্তি থেকে বিজন ভূমিতে বিতাড়িত করেছিলেন। তিনি আরও দেখলেন যে, লোকটির আশেপাশে বেহেশ্‌তের হূর-পরীগণ তাকে বেষ্টন করে বসে আছে। এতদ্দর্শনে হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহ্‌র নিকট আরয করলেন ঃ 'হে মহান প্রভু! এই লোকটি তো সে-ই যাকে আমি আপনার হুকুমে শহর ও বস্তি থেকে বহিস্কার করেছি।' আল্লাহ্‌ তা'আলা বললেন ঃ 'হে মূসা! আমি তার প্রতি দয়া ও রহমত নাযিল করেছি এবং তার যাবতীয় পাপকার্য ক্ষমা করে দিয়েছি। কারণ, সে এই বিজন প্রান্তরে স্বীয় জন্মভূমি, পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি ও পরিবার-পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অসহায় অবস্থায় কান্নাকাটি করেছে। আমি তার মা'র দেহাবয়বে বেহেশতের হূর, তার পিতার সাদৃশ্যে বেহেশতের ফেরেশ্‌তা এবং তার স্ত্রীর আকৃতিতে অপর একজন হূর পাঠিয়ে দিয়েছি। এরা সকলেই আমার কাছে

তার এই দুঃখ-যাতনায় ভরপুর মুসাফেরী অবস্থার প্রতি রহম ও করুণার জন্য প্রার্থনা করেছে। একজন আশ্রয়হীন মুসাফির যখন মারা যায়, তখন আসমান ও যমীনের সমগ্র মখলুক তার প্রতি দয়া ও রহমত বর্ষণের জন্য (আল্লাহ্‌র কাছে) প্রার্থনা করতে থাকে ; সুতরাং এ অবস্থায় আমি কি তার প্রতি দয়া ও করুণা প্রদর্শন করবো না? অথচ আমিই একমাত্র অনন্ত মেহেরবান ও অসীম দয়ালু।'

কোন মুসাফির যখন অন্তিম সময়ে উপনীত হয়, তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন ঃ 'ওহে আমার ফেরেশ্‌তাগণ! লোকটি স্বদেশত্যাগী মুসাফির, স্বীয় পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্ততি, পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজন থেকে বহুদূরে অবস্থানরত। মৃত্যুর পর তার জন্য ক্রন্দনকারী অথবা শোক বা দুঃখ প্রকাশকারী কেউ নাই।' একথা বলে আল্লাহ্‌ তা'আলা তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি ও আত্মীয়-স্বজনের আকৃতি ও দেহাবয়বে কয়েকজন ফেরেশ্‌তা পাঠিয়ে দেন। তারা সেই মুসাফির ব্যক্তির শিয়রপার্শ্বে উপবেশন করলে, সে চক্ষু উন্মিলন করে তাদেরকে প্রত্যক্ষ করে এবং অপার্থিব আনন্দ উপভোগ করে। অতঃপর এই উৎফুল্ল অবস্থাতেই সে ইহজগত ত্যাগ করে। তারপর যখন এ ব্যক্তির জানাযা উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন ফেরেশ্‌তাগণও তার সঙ্গে থাকেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত সেই ব্যক্তির কবরের পার্শ্বে বসে তার মাগফেরাত ও উচ্চ মর্যাদার জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে মুনাজাত করতে থাকেন। আল্লাহ্‌ পাক ইরশাদ করেন ঃ

اَللّٰهُ لَطِيْفٌ بِعِبَادِهٖ

'আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর বান্দাদের প্রতি দয়ালু।' (শূরা ঃ ১৯)

হযরত ইব্‌নে আত্তার (রহঃ) বলেন ঃ 'তুমি যদি কোন বান্দার অন্তকরণের সত্যাসত্য ও প্রকৃত অবস্থা যাচাই করতে চাও, তা'হলে তার সুখ-স্বাচ্ছন্দ ও দুঃখ-কষ্ট উভয় অবস্থার কার্যকলাপের প্রতি লক্ষ্য কর। যদি সে কেবল সুখ-স্বাচ্ছন্দের সময়েই আল্লাহ্‌র শোকর আদায় করে, অথচ দুঃখ-কষ্টের সময় হা-হুতাশ করে, তা'হলে বুঝতে হবে সে মিথ্যুক ও প্রতারক। বস্তুতঃ কোন ব্যক্তি যদি সমগ্র জ্বিন ও মানবের সাকুল্য জ্ঞানের অধিকারী হয়, অতঃপর কোন দুর্ভোগে পতিত হওয়ার পর কোনরূপ শেকায়াত বা অভিযোগ

উত্থাপন করে, তা'হলে এ কথা নিশ্চিত যে, তার সমস্ত ইল্‌ম ও জ্ঞানচর্চা সম্পূর্ণ বৃথা এবং সমগ্র আমল ও ইবাদত একেবারে নিস্ফল। হাদীসে কুদসীতে আছে, আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

مَنْ لَّمْ يَرْضَ بِقَضَائِيْ وَلَمْ يَشْكُرْ لِعَطَائِيْ فَلْيَطْلُبْ رَبًّا سِوَائِيْ

'যে ব্যক্তি আমার (নির্ধারিত) তাকদীরের প্রতি অসন্তুষ্ট এবং আমার দান ও নে'আমতে অকৃতজ্ঞ, সে যেন আমাকে ছাড়া অন্য কোন রব তালাশ করে নেয়।'

হযরত ওয়াহ্‌ব ইব্‌নে মুনাব্বিহ (রহঃ) বলেন ঃ 'একজন নবী দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসরকাল আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদতে মগ্ন ছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে জানালেন যে, 'আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছি।' নবী বললেন ঃ 'ইয়া আল্লাহ্! আপনি আমার কোন্ বিষয় ক্ষমা করলেন ; আমি তো জীবনে কোন গুনাহ্-ই করি নাই।' অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা নবীর একটি শিরাকে আদেশ করলেন। ফলে, সেই শিরাতে অসহনীয় বিষ-বেদনা আরম্ভ হয়ে গেল এবং বিষম যন্ত্রণায় নবী সারারাত্রি ঘুমাতে পারলেন না। সকাল বেলা আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশ্‌তা পাঠালেন। ফেরেশ্‌তা বললেন ঃ 'আপনার মহান প্রভু আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,—'তোমার দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের ইবাদত আমার দেওয়া একটা সামান্য সুস্থ শিরা'র নে'আমতের সমান নয়।'

অধ্যায় ঃ ৪

আধ্যাত্মিক সাধনা ও রিপুর তাড়না

আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মুসা আলাইহিস সালামের নিকট ওহী পাঠিয়ে-ছিলেন ঃ 'হে মুসা! তোমার কথা তোমার জিহ্বার যতটুকু নিকটবর্তী, অনুরূপ তোমার হৃদস্পন্দন তোমার হৃদয়ের, তোমার রূহ তোমার দেহের, তোমার দৃষ্টিশক্তি তোমার চোখের, তোমার শ্রবণশক্তি তোমার কানের যতটুকু নিকটবর্তী, সেই তুলনায় তুমি যদি চাও—আমি (আল্লাহ) তোমার আরও অধিকতর নিকটবর্তী হই, তা'হলে তুমি আমার হাবীব হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর অধিক পরিমাণে দরূদ পাঠ কর।

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন ঃ

وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ

'প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত, আগামী কালের জন্য সে কি প্রেরণ করে, তা চিন্তা করা।' (হাশর ঃ ১৮)

অর্থাৎ,– হে মানব! কিয়ামতের দিন জবাবদেহী করার জন্য তুমি কি আমল করেছো?

এ কথা সর্বদা স্মরণ রেখো যে, তোমার নফস বা রিপুই হচ্ছে তোমার সবচেয়ে বড় দুশমন। এমনকি শয়তানের চেয়েও সে তোমার জন্য অধিকতর জঘন্য ও মারাত্মক। কারণ, খোদ শয়তানও প্রকৃতপক্ষে তোমার রিপুর তাড়না ও কামনা-বাসনা থেকেই শক্তি যুগিয়ে থাকে। তারপর সে তোমাকে ধোকা-প্রতারণার জালে আবদ্ধ করে তোমার ক্ষতি সাধনে সমর্থ হয়। অতএব এ ব্যাপারে কঠোর সতর্কতা অবলম্বন কর। প্রবৃত্তির তাড়নায় অহেতুক কামনা-বাসনা ও আকাংখা-অভিলাষের মাধ্যমে নিজকে শয়তানের প্রবঞ্চনার শিকারে পরিণত করো না। নফস বা কুপ্রবৃত্তি সবসময়ই উদাসীন ও অচেতন থাকতে চায়। বস্তুতঃ এটা তার মজ্জাগত স্বভাব, এজন্যে তার সকল দাবীই

মিথ্যা। সুতরাং তাকে কোন ব্যাপারেই বিশ্বাস করো না, তার সাথে আপোষ করো না। নফসের ধোকায় প্রতারিত হয়ে যদি কোন বিষয়ের প্রতি তুমি আকৃষ্ট হয়ে পড়, তা'হলে এ কথা সত্য জেনে রাখ যে, এই নফস তোমাকে পরিণামে জাহান্নামে পৌছিয়ে ছাড়বে। বস্তুতঃ নফস থেকে কোনই কল্যাণের আশা করা যায় না ; এই নফসই হচ্ছে সকল অনিষ্টের মূল, সকল আপদ ও লাঞ্ছনার হেতু, অভিশপ্ত ইবলীসের আসল সম্পদ ও হাতিয়ার, সকল অহিতকর কর্মকাণ্ডের শিকড়। আল্লাহ্ ছাড়া এর প্রকৃত রহস্য ও হাকীকত অনুধাবন করা অন্য কারও পক্ষে সম্ভব নয়। অতএব, সদাসর্বদা এক আল্লাহ্র ভয় অন্তরে জাগরুক করে রাখ। তিনি সর্বজ্ঞ ; আমলের ভালমন্দ সবকিছু সম্পর্কে তিনি সম্যক পরিজ্ঞাত।

আখেরাতের জীবনকে সুন্দর–সফল ও উন্নততর করার জন্য বান্দা যখন স্বীয় অতীত জীবনের কৃতকর্মের প্রতি চিন্তানিবেশ করে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তার অন্তকরণকে স্বচ্ছ–পরিচ্ছন্ন করে দেন। হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

تَفَكُّرُ سَاعَةٍ خَيْرٌ مِّنْ عِبَادَةِ سَنَةٍ

'এক মুহূর্তকালের ধ্যানমগ্নতা বছরকালের ইবাদত অপেক্ষা উত্তম।'

হযরত আবুল–লাইস (রহঃ) কর্তৃক বিশ্লেষিত তফসীর থেকে উক্তরূপ ব্যাখ্যা বোধগম্য হয়। সুতরাং প্রকৃত বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ লোকের কর্তব্য হচ্ছে, অতীতের সমুদয় পাপকার্য হতে সঠিক তওবা ও অনুতাপ করা। আখেরাতের জীবনে মুক্তি ও সাফল্যের বিষয়ে অগ্রগামী হওয়া, আল্লাহ্ তা'আলার সান্নিধ্যে অধিকতর নৈকট্যলাভের চিন্তা–সাধনায় মনোনিবেশ করা, অনতিবিলম্বে আল্লাহর যিক্রে নিমগ্ন হওয়া, সকল হারাম ও নিষিদ্ধ কার্য পরিত্যাগ করা, প্রবৃত্তির তাড়নায় ব্যতিব্যস্ত না হয়ে ধৈর্য–সহিষ্ণুতা অবলম্বন করা, নফসানী খাহেশের অনুসরণ চিরতরে পরিহার করা। কেননা, নফস হচ্ছে মূর্তি সদৃশ ; সুতরাং যে ব্যক্তি নফসের তাবেদারী করলো, প্রকারান্তরে সে মূর্তি পূঁজায় লিপ্ত হলো। আর যে ব্যক্তি নিষ্ঠা ও ইখলাসের সাথে আল্লাহ্র ইবাদত–বন্দেগীতে মগ্ন হলো, সত্যিকার অর্থে সে–ই হলো নফসের সাথে কঠোর বিরুদ্ধাচরণকারী ও প্রকৃত সংযমী।

কথিত আছে, বিখ্যাত বুযুর্গ হযরত মালেক ইবনে দীনার (রহঃ) একদা বসরা শহরের একটি বাজার অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন, এমন সময় একটি ডুমুর ফলের প্রতি তার দৃষ্টি পতিত হয়। ফলটি দেখে তাঁর অন্তরে তা' ভক্ষণ করার স্পৃহা জন্মায়। তখন তিনি স্বীয় পাদুকা খুলে বিক্রেতাকে এর বিনিময়ে ফলটি দিতে অনুরোধ করলেন। কিন্তু ফল বিক্রেতা জুতার মূল্যহীনতার কথা ব্যক্ত করে ফল বিক্রয় করতে অসম্মতি জ্ঞাপন করলো। অতঃপর মালেক ইব্নে দীনার আপন পথে রওয়ানা হয়ে গেলেন। এদিকে অপর একজন লোক এসে বিক্রেতাকে বললো ঃ 'আপনি কি জানেন, তিনি কে? তিনিই মালেক ইবনে দীনার।' দেশের সুবিখ্যাত বুযুর্গের নাম শুনে লোকটি অত্যন্ত আক্ষেপ করতে লাগলো এবং কৃতদাসের মাথায় ডুমুর বোঝাই একটি টুকরী দিয়ে বললো,—'যাও, যদি ইব্নে দীনার এ সবগুলো ফল গ্রহণ করে নেন, তা'হলে তুমি আযাদ ; গোলামীর শৃংখল থেকে তুমি আজ হতে মুক্ত।' গোলাম ছুটে গেল এবং ইব্নে দীনারকে অনুরোধ করতে লাগলো। কিন্তু ইব্নে দীনার ফল গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। গোলাম পুনরায় অনুরোধ করে বললো,—'আপনি যদি এগুলো কবুল করে নেন, তা'হলে আমি গোলামীর শৃংখল থেকে মুক্তিলাভ করতে পারি।' ইব্নে দীনার (রহঃ) এতদসত্ত্বেও অসম্মতি জানিয়ে বললেন ঃ 'আমার গ্রহণ করাটা যদিও তোমার জন্য মুক্তির কারণ ; কিন্তু আমার জন্য তা' শাস্তির কারণ।' গোলাম অতঃপর বারবার অনুরোধ করলে তিনি বললেন,— 'আমি কসম খেয়ে নিয়েছি যে, ডুমুরের বিনিময়ে আমি আমার ঈমানকে বিক্রি করবো না এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত কোনদিন ডুমুর খাবো না।'

হযরত মালেক ইব্নে দীনার (রহঃ) অন্তিমকালীন অসুস্থতার সময় একবার দুধ ও মধু মিশ্রিত গরম রুটির সরীদ (সুস্বাদু খাদ্য) খাওয়ার আকাংখা প্রকাশ করেছিলেন। খাদেম যথাসময়ে সরীদ এনে হাজির করার পর কিছুক্ষণ তিনি সরীদের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে তাকিয়ে রইলেন, অতঃপর বললেন,—'হে নফস! তুমি দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর ধরে কৃচ্ছ্র–সাধনায় ধৈর্যধারণ করে আসছো, এখন এই অন্তিম অবস্থায় যখন তোমার মৃত্যুর মাত্র মুহূর্তকাল বাকী আছে, ... এতটুকু বলে তিনি সরীদের পাত্র হাত থেকে রেখে দিলেন এবং তৎক্ষণাৎ মৃত্যুবরণ করলেন। বস্তুতঃ আম্বিয়ায়ে কেরাম

আলাইহিমুস সালাম, আওলিয়া, সাধক, আল্লাহর প্রেমিক ও দুনিয়াত্যাগী বুযুর্গগণের হৃদয়ের অবস্থাই ছিল এরূপ ; তারা পারলৌকিক সুখ-শান্তির তুলনায় নশ্বর পৃথিবীর সবকিছুকে তুচ্ছাতিতুচ্ছ জ্ঞান করতেন।

হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম বলেছেন,— 'যে ব্যক্তি স্বীয় প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পেরেছে, সে দিগ্বিজয়ী সেনাপতির চাইতেও বড় বাহাদুর।'

হযরত আলী (রাযিঃ) বলেন,— 'আমার এবং আমার নফসের উপমা হচ্ছে রাখাল ও ছাগলের পালের ন্যায় ; একদিক থেকে একত্রিত সুশৃংখল করে আনে, অপরদিকে সব ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। বস্তুতঃ যে নিজের নফসকে হত্যা করতে পেরেছে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে রহমতের কাফন পরিয়ে ইয্যতের মাটিতে দাফন করবেন। আর যে ব্যক্তি নিজের আত্মাকে অকেজো করে রেখেছে, তাকে অভিশাপের কাফন পরানো হবে এবং আযাবের মাটিতে দাফন করা হবে।'

ইয়াহয়া ইব্‌নে মু'আয রাযী (রহঃ) বলেন ঃ 'ইবাদত ও আধ্যাত্ম্য সাধনার মাধ্যমে স্বীয় প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ কর। আধ্যাত্ম্য সাধনা হচ্ছে,— নিদ্রা ও খাদ্যের পরিমাণ হ্রাস করা, অধিক কষ্ট সহ্য করা, মুসীবতে ধৈর্যধারণ করা, উৎপীড়নে অধৈর্য হয়ে প্রতিশোধ গ্রহণে উদ্যত না হওয়া। জেনে রাখ—নিদ্রার স্বল্পতা তোমার অন্তরে নূর সৃষ্টি করবে, তোমার চিন্তাশক্তিতে স্বচ্ছতা আনয়ন করবে। আহারের স্বল্পতা তোমাকে নানাবিধ আপদ থেকে রক্ষা করবে। দুঃখ-কষ্ট ও উৎপীড়নে ধৈর্যধারণ তোমাকে ঈপ্সীত লক্ষ্যে পৌছাবে। পক্ষান্তরে অধিক ভোজন হৃদয়কে কঠিন করে তোলে, অন্তকরণকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে দেয়। বস্তুতঃ ক্ষুধা ও ক্ষুৎপিপাসা মানবহৃদয়ে হিকমত ও তত্ত্বজ্ঞানের তীক্ষ্ণতা আনয়ন করে। আর পরিতৃপ্ত ভোজন মানুষকে আল্লাহ্ থেকে দূরে সরিয়ে নেয়।

হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ 'জঠরজ্বালার মাধ্যমে তুমি তোমার অন্তকরণকে জ্যোতির্ময় করে তোল, ক্ষুধা ও তৃষ্ণার অস্ত্রের দ্বারা তুমি তোমার রিপুর বিরুদ্ধে জিহাদে প্রবৃত্ত হও। ক্ষুধার সাহায্যে তুমি সদা বেহেশ্‌তের দরজায় কষাঘাত করতে থাক। কেননা এতে তোমার আমলনামায় জিহাদের সওয়াব লিপিবদ্ধ হবে।' বস্তুতঃ

ক্ষুধা ও তৃষ্ণার চাইতে অধিক প্রিয় আল্লাহ্‌র কাছে আর কিছু নাই। যে ব্যক্তি অধিক ভোজন করেছে, সে আসমানের মালাকূতী জগতে প্রবেশ করতে পারবে না ; ইবাদতে আস্বাদ গ্রহণ থেকেও সে বঞ্চিত হবে।

হযরত আবূ বকর (রাযিঃ) বলেছেন ঃ 'আমি ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার পর উদরপূর্তি করে কোনদিন আহার করি নাই। কারণ এতে ইবাদতের স্বাদ থেকে বঞ্চিত হতে হয়। অনুরূপ আমি কোনদিন তৃষ্ণা মিটিয়ে পানিও পান করি নাই। কেননা আমার অন্তরে খোদার দীদারের তীব্র আকাংখা রয়েছে।' এতদ্ব্যতীত অধিক ভোজন ইবাদতকার্যে শৈথিল্য ও স্বল্পতা আনয়ন করে। অতিরিক্ত আহারের কারণে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভারী হয়ে যায়, নিদ্রার প্রাদুর্ভাব দেখা দেয় এবং গোটা দেহ অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। ফলে, মানুষ নিতান্ত নিস্কর্মা হয়ে যায়। বস্তুতঃ মানুষ যদি অতিরিক্ত ঘুমে অভিভূত হয়ে জীবন কাটিয়ে দেয়, তা'হলে এটা নিজকে মৃতদেহে পরিণত করার নামান্তর।

হযরত লুকমান হাকীম (রহঃ) স্বীয় পুত্রকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছিলেন,—'অধিক মাত্রায় নিদ্রা ও ভোজন থেকে নিজকে বিরত রাখ। কেননা অধিক নিদ্রাযাপনকারী ও অধিক ভোজনকারী কিয়ামতের দিন আমল ও ইবাদতশূন্য হবে।'

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

لَا تُمِيتُوا الْقُلُوبَ بِكَثْرَةِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ فَإِنَّ الْقَلْبَ يَمُوتُ كَالزَّرْعِ إِذَا كَثُرَ عَلَيْهِ الْمَاءُ.

'অধিক পানাহার করে আত্মাকে নিধন করো না। কেননা অধিক বৃষ্টির কারণে যমীনের ফসল যেমন বিনষ্ট হয়ে যায়, তেমনি অধিক পানাহারে তোমার আত্মাও মরে যাবে।'

জনৈক বুযুর্গ বিষয়টি একটি উদাহরণ দ্বারা আরও স্পষ্ট করে বুঝিয়েছেন,— 'মানুষের পাকস্থলী হচ্ছে ডেগচি বা রন্ধনপাত্র সদৃশ, এর উপরে রয়েছে আত্মা। পাকস্থলীরূপ ডেগচি হতে বাষ্প নির্গত হয়ে আত্মা পর্যন্ত পৌছে। অধিক ভোজনের ফলে যদি এই বাষ্প অধিক মাত্রায় নির্গত

হয়, তা'হলে অবশ্যই তা' আত্মাকে কলুষিত করে।' বস্তুতঃ অধিক ভোজনে জ্ঞান-বুদ্ধি লোপ পেয়ে যায়, মেধার প্রখরতা বিনষ্ট হয়, স্মরণশক্তি বিলুপ্ত হয়।

একদা হযরত ইয়াহ্‌য়া আলাইহিস সালামের সাথে অভিশপ্ত ইবলীসের দেখা হয়। ইবলীসের হস্তস্থিত একটি বস্তুর প্রতি ইঙ্গিত করে আল্লাহ্‌র নবী জিজ্ঞাসা করলেন ঃ 'এটা কি তোমার হাতে?' ইবলীস বললো,— এটা শাহ্‌ওয়াত বা প্রবৃত্তির তাড়না ; এটা দিয়ে আমি বনী আদমকে শিকার করে থাকি। হযরত ইয়াহ্‌য়া আলাইহিস সালাম জিজ্ঞাসা করলেন, আমাকে শিকার করার জন্যেও কি তোমার কাছে কিছু আছে? ইবলীস বললো,—'না ; তবে এক রাত্রিতে আপনি পরিতৃপ্ত হয়ে ভোজন করেছিলেন, সেই সুযোগে আমি আপনাকে অবসাদগ্রস্ত করে নামায হতে উদাসীন করে দিয়েছিলাম।' হযরত ইয়াহ্‌য়া আলাইহিস সালাম বললেন ঃ 'আজ থেকে আমি আর কোনদিন তৃপ্ত হয়ে আহার করবো না। 'ইবলীস বললো,— তা'হলে আমিও আজ থেকে আর কোনদিন বনী আদমকে নসীহত করবো না। প্রিয় সাধক! চিন্তা কর, শুধুমাত্র এক রাত্রির তৃপ্ত আহারের এই পরিণাম! আর যারা জীবনের একটি রাত্রিও ক্ষুধার্ত অবস্থায় কাটায় নাই, তাদের দ্বারা আল্লাহ্‌র কি ইবাদত হতে পারে?

এক রাত্রিতে হযরত ইয়াহ্‌য়া আলাইহিস সালাম তৃপ্ত হয়ে যবের রুটি আহার করেছিলেন। ফলে, সেই রাত্রিতে তিনি আল্লাহর যিক্‌র করতে পারেন নাই। অতঃপর তাঁর নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী এসেছে ঃ 'হে ইয়াহ্‌য়া! আমার বেহেশতের চাইতেও কি উত্তম কোন আবাসস্থল তুমি পেয়ে গেছ? আমার সান্নিধ্যের চাইতেও কি উত্তম কোন সাহচর্য তুমি লাভ করেছো? তবে কেন তোমার এই অবসাদ? আমার ইয্‌যত ও প্রতাপের কসম, যদি তুমি আমার তৈরী বেহেশ্‌তের প্রতি একবার দৃষ্টি কর, আর পরক্ষণে জাহান্নামের প্রতিও এক পলক তাকাও, তা'হলে অবশ্যই তুমি রক্তের অশ্রুধারা প্রবাহিত করবে এবং বস্ত্রের পোষাক পরিহার করে লোহার পোষাক পরিধান করবে।'

অধ্যায় ঃ ৫

রিপুর প্রভাব ও শয়তানের শত্রুতা

বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ লোকের কাজ হচ্ছে,—ক্ষুধা ও ক্ষুৎসাধনার মাধ্যমে রিপুর তাড়না ও কাম উত্তেজনাকে সমূলে বিনাশ করে দেওয়া। কেননা খোদার দুশমন শয়তানকে ধ্বংস করার জন্য ক্ষুৎসাধনাই হচ্ছে প্রধান হাতিয়ার। পাপিষ্ঠ শয়তান প্রবৃত্তির সাধ-অভিলাষ ও অধিক পানাহারকেই কেন্দ্র করে মানুষকে বিভ্রান্ত করে থাকে। হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِى مِنِ ابْنِ اٰدَمَ مَجْرَى الدَّمِ فَضَيِّقُوْا مَجَارِيَهٗ بِالْجُوْعِ ـ

'শয়তান মানুষের রন্ধ্রে রন্ধ্রে রক্তের ন্যায় প্রবহমান হয়, সুতরাং তোমরা শয়তানের এ প্রবাহপথকে ক্ষুৎসাধনার দ্বারা বন্ধ করে দাও।'

ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলার অধিক নিকটবর্তী হবে সেই ব্যক্তিই, যে দুনিয়াতে ক্ষুধা ও তৃষ্ণার যন্ত্রণা সহ্য করেছে। বস্তুতঃ অধিক ভোজনস্পৃহা আদম সন্তানকে মারাত্মক ধ্বংসের দিকে ঠেলে নেয়। হযরত আদম ও হাওয়া আলাইহিমাস সালাম চিরশান্তির আবাস জান্নাত থেকে বহিস্কৃত হয়ে এই অশান্তির জগতে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন,—এর পিছনেও কারণ ছিল ভোজনস্পৃহা। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদেরকে বেহেশ্‌তের একটি নির্দিষ্ট ফল খেতে নিষেধ করেছিলেন, তখন একমাত্র অধিক ভোজনস্পৃহার কারণেই তাঁরা উক্ত নির্দেশ পালন করতে পারেন নাই। ফলে, তাঁদের লজ্জাবরণ সংরক্ষিত থাকে নাই। মোটকথা, উদরই হচ্ছে মানুষের সর্ববিধ পাপাচারের উৎস ও ধ্বংসের মূল কারণ। জনৈক বুযুর্গ বলেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি স্বীয় রিপুর কাছে পরাজিত হলো, সে প্রবৃত্তির হাতে বন্দী হয়ে গেল। তার অন্তর হিত-কল্যাণ থেকে বঞ্চিত থাকবে। যে ব্যক্তি স্বীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যমীনে

স্বেচ্ছাচারিতার পানি সিঞ্চন করলো, সে মূলতঃ আপন অন্তঃকরণে লাঞ্ছনা ও আক্ষেপের বৃক্ষ রোপণ করল।'

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কুদরতে তিন প্রকার মাখলুক সৃষ্টি করেছেন ঃ এক,—ফেরেশতা। এঁদেরকে তিনি বিবেক-বুদ্ধি দিয়েছেন ; কিন্তু কামভাব দেন নাই। দ্বিতীয়,— জীব-জন্তু। এদেরকে কামভাব দিয়েছেন ; কিন্তু বিবেক-বুদ্ধি দেন নাই। তৃতীয় প্রকার হচ্ছে মানব। এদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা বিবেক-বুদ্ধি এবং কামভাব উভয়টাই দান করেছেন। এদের মধ্যে যারা নিজেদের বিবেক-বুদ্ধিকে বলবান করে কামরিপু ও যথেচ্ছাচারিতাকে দুর্বল ও পরাজিত করতে পেরেছে, তারা ফেরেশ্তা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। আর যাদের বিবেক-বুদ্ধি রিপুর কাছে পরাজয় বরণ করেছে, তারা হিংস্র জীব-জানোয়ারের চাইতেও নিকৃষ্ট।

হযরত ইব্রাহীম খাওয়াস (রহঃ) বলেন,—'একদা আমি 'লাকাম' পর্বতে অবস্থান করছিলাম। তখন একটি আনারের প্রতি আমার দৃষ্টি পড়ায় অন্তরে সেটি খাওয়ার আকাংখা সৃষ্টি হলো। আনারটি হাতে নিয়ে বিদীর্ণ করে সামান্য স্বাদ গ্রহণ করার পর টক হওয়ার কারণে সেটি ফেলে দিলাম। অতঃপর পথ চলাকালে একজন লোকের প্রতি আমার দৃষ্টি পড়লো ; লোকটি রাস্তায় নেহায়েত অসহায় অবস্থায় পড়ে আছে আর অজস্র ভীমরুল তাকে আচ্ছন্ন করে রয়েছে। আমি তাকে সালাম প্রদান করলে সে উত্তরে বললো ঃ 'ওয়াআলাইকুমুস সালাম হে ইব্রাহীম! আমি চমকিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি আমাকে কিভাবে চিনতে পারলেন? লোকটি বললো, যে আল্লাহ্কে চিনতে পেরেছে তার কাছে গোপন ও অপরিচিত বলতে কিছু নাই। আমি বললাম, আল্লাহ্র সাথে আপনার অতি রহস্যপূর্ণ অবস্থা আমি লক্ষ্য করেছি ; আপনি কি ভীমরুলের আক্রমণ থেকে নিরাপত্তার জন্য দো'আ করেন নাই? অতঃপর লোকটি বললো,—আমিও আপনার বিশেষ রহস্যময় অবস্থা প্রত্যক্ষ করেছি ; আপনি কি আনার ফলের লোভ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য মোনাজাত করেন নাই? শুনুন, ভীমরুলের উৎপীড়ন-যন্ত্রণা শুধু ইহকাল পর্যন্তই সীমাবদ্ধ, আর আনারের প্রতি লোলুপ দৃষ্টির প্রায়শ্চিত্ত আখেরাতেও ভোগ করতে হবে। ভীমরুল কেবল দৈহিক যন্ত্রণা দিতে পারে ; কিন্তু লোভ-লালসা অন্তরাত্মাকে ক্ষত-বিক্ষত করে ফেলে। একথা শুনার পর আমি সেখান

থেকে প্রস্থান করলাম।'

বস্তুতঃ রিপুর তাড়না ও যথেচ্ছাচারিতা বাদশাহকে গোলামে পরিণত করে এবং ধৈর্য ও সংযম গোলামকে বাদশাহর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করে। এ প্রসঙ্গে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম ও যুলায়খার জীবনালেখ্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, হযরত ইউসুফ (আঃ) ধৈর্য ও সংযমশীলতার ফলশ্রুতিতে মহান সম্রাট ও শাসনকর্তার মর্যাদা লাভ করেছিলেন। আর যুলায়খা শুধুমাত্র কাম-প্রবৃত্তির অনুসরণের পরিণতিতে জঘন্যভাবে হেয় প্রতিপন্ন হয়েছেন। কারণ যুলায়খা হযরত ইউসুফকে ভালবাসতে গিয়ে ধৈর্য-সহিষ্ণুতা ও সংযমের পরিচয় দিতে পারেন নাই।

আবুল হাসান রাযী (রহঃ) স্বীয় পিতাকে মৃত্যুর দুই বৎসর পর স্বপ্নে দেখলেন যে, তিনি আলকাতরার পোষাক পরিহিত অবস্থায় আছেন। জিজ্ঞাসা করলেন ঃ 'আব্বাজান! আপনার অবস্থা দোযখবাসীদের ন্যায় দেখা যাচ্ছে, এর কারণ কি?' পিতা বললেন,— 'হে পুত্র! আমার রিপু ও কুপ্রবৃত্তি আমাকে দোযখে ঠেলে দিয়েছে। প্রিয় পুত্র! নফস ও প্রবৃত্তির ব্যাপারে তুমি কখনো গাফেল হয়ো না ; সদা সতর্ক ও সচেতন থেকে এহেন শত্রু হতে আত্মরক্ষা করার চেষ্টা কর। কেননা আজকে আমার এ দুর্দশার কারণই হচ্ছে ইবলীস, দুনিয়ার মোহ, প্রবৃত্তির অনুসরণ এবং কাম-বাসনা চরিতার্থকরণ। এরই ফলশ্রুতিতে আমি ধ্বংস ও বিনাশের এই অতল গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হয়েছি। নিজের দুর্ভাগ্য আমি নিজেই টেনে এনেছি, জেনেশুনে শত্রুকে প্রশ্রয় দিয়েছি। ফলে, আমি নাজাতের কোনই আশা করতে পারছি না।'

হযরত হাতেম আছাম্ম (রহঃ) বলেন,—'প্রবৃত্তি আমার সীমান্ত রেখা, জ্ঞান-বিদ্যা আমার অস্ত্র, পাপ আমার লাঞ্ছনা ও অপমান, শয়তান আমার শত্রু এবং রিপু আমার প্রতারক ও প্রবঞ্চনাকারী।'

জনৈক বুযুর্গ বলেছেন ঃ 'জিহাদ তিন প্রকারে বিভক্ত ঃ এক,— পথভ্রষ্ট ও বাতিলপন্থীদের বিরুদ্ধে যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে জিহাদ করা। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

'তাদের সাথে বিতর্ক করুন সদ্ভাবে।' (নাহ্‌ল ঃ ১২৫)

দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে,—কাফের ও মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা ; এটা স্পষ্ট যুদ্ধ। যেমন কুরআন পাকে ইরশাদ হয়েছে ঃ

يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

'তারা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করে।' (মায়িদাহ ঃ ৫৪)

তৃতীয়,—রিপু ও কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ করা । যেমন আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন ঃ

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

'যারা আমার উদ্দেশ্যে জিহাদ (সাধনা) করে, তাদেরকে অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করবো।' (রূম ঃ ৬৯)

এই মর্মে হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

أَفْضَلُ الْجِهَادِ جِهَادُ النَّفْسِ -

'রিপুর বিরুদ্ধে জিহাদ করাই হচ্ছে উত্তম জিহাদ।'

সাহাবায়ে কেরাম কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ সম্পন্ন করে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে প্রত্যাবর্তন করার পর বলতেন ঃ

رَجَعْنَا مِنَ الْجِهَادِ الْأَصْغَرِ إِلَى الْجِهَادِ الْأَكْبَرِ -

'আমরা ক্ষুদ্রতম জিহাদ সমাপন করে বৃহত্তম জিহাদে (প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে) প্রত্যাবর্তন করেছি।' প্রবৃত্তি ও শয়তানের বিরুদ্ধাচরণকে 'বৃহত্তম জিহাদ' নামে অভিহিত করার তাৎপর্য হচ্ছে,—কাফেরের বিরুদ্ধে জিহাদ করার ব্যাপারটা একান্ত সাময়িক ; কিন্তু শয়তান, কাম-প্রবৃত্তি ইত্যাদি মানুষের সার্বক্ষণিক শত্রু, হর-হামেশা মানুষের সাথে এদের বিসম্বাদ লেগেই থাকে। এছাড়া কাফেরের বিরুদ্ধে জিহাদকারী ব্যক্তি শত্রুকে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করতে পারে ; কিন্তু নফ্‌স ও শয়তান মানুষের চোখে ধরা পড়ে না। আর একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, দৃশ্যমান শত্রুর চাইতে অদৃশ্য শত্রু মারাত্মক

ও ধ্বংসাত্মক হয় বেশী। এছাড়া আরও একটি কারণ হচ্ছে,—শয়তান সরাসরি রিপু ও কুপ্রবৃত্তিকে তোমার বিরুদ্ধে সাহায্য করে ; আর এক্ষেত্রে রিপুই হচ্ছে সকল অনিষ্ট ও স্বেচ্ছাচারিতার মূল। পক্ষান্তরে কাফের তোমার রিপু বা নফ্‌সের পক্ষে সাহায্যকারী নয়। এতদ্ব্যতীত আরও কারণ হচ্ছে যে, কোন কাফেরকে তুমি হত্যা করতে সক্ষম হলে গণীমতের মাল ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা লাভ করবে ; আর যদি কোন কাফেরের হাতে তুমি নিহত হও, তা'হলে শাহাদতের মর্যাদা ও জান্নাত লাভ করবে। সুতরাং এখানে উভয় দিকেই তোমার স্বার্থ ও কল্যাণ রয়েছে। পক্ষান্তরে শয়তানকে হত্যা করার ক্ষমতা তোমার নাই ; অথচ তোমাকে ধ্বংস করার ক্ষমতা শয়তানের আছে। খোদা না করুন যদি শয়তান তোমাকে ধ্বংস করে ফেলে, তা'হলে তুমি চিরশাস্তির ফাঁদে পড়ে গেলে। সুতরাং এখানে উভয় দিকেই তোমার ক্ষতি ও ধ্বংস অনিবার্য। এজন্যেই বুযুর্গানে দ্বীন বলেছেন ঃ 'যুদ্ধক্ষেত্রে যার ঘোড়া পলায়ন করে, সে শত্রুর হাতে বন্দী হয়, আর শয়তানের ফাঁদে পড়ে যার ঈমান বিলুপ্ত হয়, সে আল্লাহ্‌র আযাব ও গজবে গ্রেফতার হয়। অনুরূপ যে ব্যক্তি কাফেরের হাতে বন্দী হয়, তার হস্তদ্বয় জিঞ্জীর দিয়ে গলার সাথে বেঁধে দেওয়া হয় না, তার পদদ্বয় বাঁধা হয় না, তার উদর অভুক্ত থাকে না। কিন্তু আল্লাহ্‌র আযাব ও গজবে গ্রেফতার ব্যক্তির অবস্থা খুবই করুণ, খুবই মারাত্মক,—তার মুখমণ্ডল কালো অন্ধকার করে দেওয়া হয়, হস্তদ্বয় লোহার শিকল দিয়ে গলার সাথে বেঁধে দেওয়া হয়, পায়ে আগুনের বেড়ী পরিয়ে দেওয়া হয়, অগ্নি পান করানো হয়, অগ্নি খাওয়ানো হয়, অগ্নির পোষাক পরানো হয়।'

অধ্যায় ঃ ৬

গাফলতি ও উদাসীনতা

গাফলতি ও উদাসনীতা মানুষের আফ্‌সুস ও হা-হুতাশ বৃদ্ধি করে, শুভ পরিণতির কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করে, আখেরাতের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও আরাম-আয়েশ থেকে মাহ্‌রূম করে, ইবাদতের বিঘ্নতা ঘটায়, হিংসা-দ্বেষ বাড়িয়ে তোলে, পরিণামে লজ্জা, ভর্ৎসনা, তিরস্কার ও অপমানের কারণ হয়।

জনৈক পুণ্যবান ব্যক্তি তার উস্তাদকে মৃত্যর পর স্বপ্নযোগে জিজ্ঞাসা করেছিল,—'মৃত্যুর পর আপনি দুনিয়ার কোন্ বিষয়টির উপর আক্ষেপ করাকে সবচেয়ে মারাত্মক পেয়েছেন?' উত্তরে তিনি বলেছেন,-'গাফলতি ও অসাবধানতার আক্ষেপকে।'

বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি হযরত যুন্নুন মিসরী (রহঃ)-কে স্বপ্নযোগে জিজ্ঞাসা করেছিল,—'মৃত্যুর পর আল্লাহ্ তা'আলা আপনার সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন?' তিনি বলেছেন ঃ 'আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে তাঁর মহান দরবারে দণ্ডায়মান করে বলেছেন ঃ হে মিথ্যুক! হে অসত্যের দাবীদার! তুমি আমার প্রতি কৃত্রিম ভালবাসার দাবী করেছো, অতঃপর আমা হতে উদাসীন ও অন্যমনস্ক হয়ে রয়েছো।' জনৈক বুযুর্গ স্বীয় পিতাকে মৃত্যুর পর স্বপ্নে জিজ্ঞাসা করেছিলেন,—আব্বাজান! পরকালের এই জগতে আপনি কেমন আছেন? তিনি বললেন,—'ওহে বৎস! দুনিয়াতে আমি গাফেল ও উদাসীন ছিলাম এবং সে অবস্থায়ই আমার মৃত্যু হয়েছে, ফলে এখন আমার নানাবিধ কষ্ট ও শাস্তি ভোগ করতে হচ্ছে।'

'যাহ্‌রুর-রিয়াদ' কিতাবে আছে,—হযরত ইয়াকূব আলাইহিস সালামের সাথে মালাকুল-মওতের সখ্যতার সম্পর্ক ছিল ; তাই মালাকুল-মওত প্রায়ই হযরত ইয়াকূবের নিকট আসা-যাওয়া করতেন। একদিন হযরত ইয়াকূব তাঁকে বললেন ঃ 'আপনি কি আমার সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে এসেছেন, না জান কবজ করতে? তিনি বললেন,—সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে। অতঃপর হযরত

ইয়াকূব (আঃ) বললেন,—'আপনার নিকট আমার একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ আবেদন যে, আমার মৃত্যুর সময় যখন উপস্থিত হবে এবং আপনি আমার জান কবজ করার উদ্দেশে আগমন করবেন, তখন পূর্বাহ্নেই আমাকে অবগত করে দিবেন।' হযরত মালাকুল-মওত সম্মতি ব্যক্ত করে বললেন,—'মৃত্যুর পূর্বে অবশ্যই আমি আপনার নিকট তিনটি বার্তা পাঠাবো, তখন বুঝে নিবেন যে, আপনার মৃত্যু সন্নিকটবর্তী।' কিছুদিন পর হযরত ইয়াকূবের অন্তিম সময়ে মালাকুল-মওত উপস্থিত হলে তিনি আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। উত্তরে মালাকুল-মওত রূহ কবজের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলেন। জওয়াব শুনে হযরত ইয়াকূব (আঃ) বিস্ময়বিমূঢ় হয়ে বললেন,—আপনি কি আমার সঙ্গে মৃত্যুর পূর্বে দূত পাঠানোর ওয়াদা করেছিলেন না? কিন্তু কই, কোন দূত বা বার্তাবাহক তো আসে নাই! মৃত্যুর ফেরেশ্‌তা বললেন,—'হে আল্লাহর নবী! আমি ঠিকই আপনার কাছে দূত পাঠিয়েছি ; কিন্তু আপনি তা' লক্ষ্য করেন নাই ; আপনার কেশরাশির কৃষ্ণতার পর শুভ্রতা, আপনার দৈহিক শক্তির প্রাবল্যের পর দুর্বলতা এবং আপনার দেহ সোজা ও সটান থাকবে পর বক্রতাই মৃত্যুর পূর্বে আপনার কাছে প্রেরিত আমার দূত বা বার্তাবাহক।'

হযরত আবু আলী দাক্কাক (রহঃ) বলেন ঃ 'প্রখ্যাত এক বুযুর্গের অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে তাঁকে দেখার জন্য আমি খেদমতে হাজির হলাম। তখন তাঁর শিষ্যগণ শিয়রের পার্শ্বে উপবিষ্ট ছিল এবং তিনি ক্রন্দন করছিলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম,—'হে শায়খ! আপনি কি এই অন্তিম সময়ে দুনিয়ার মায়া-মহব্বত ও বিচ্ছেদের কারণে কান্নাকাটি করছেন?' তদুত্তরে তিনি বললেন,—'না, বরং আমি আমার নামাযের অসারত্বের কথা স্মরণ করে কাঁদছি ; জীবনের সমস্ত নামায আমি বিনষ্ট করে ফেলেছি।' আমি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম,—'এটা কিভাবে? আপনি তো সারা জীবন নামায আদায় করেছেন।' তিনি বললেন, 'আমি জীবনে যত নামাযই পড়েছি ; সিজদা করেছি, সিজ্‌দা হতে মাথা উঠিয়েছি, সবসময়ই আমার অন্তরে গাফলতি ও অবহেলা বিরাজ করতো, মনোযোগ সহকারে আমি রুকু-সিজ্‌দা করতে পারি নাই, আর আজকে আমার সেই অবস্থাতেই মৃত্যু হচ্ছে।' এতটুকু বলে তিনি একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললেন এবং কয়েকটি পংক্তি আবৃত্তি করলেন,

সেগুলোর সারমর্ম হচ্ছে ঃ 'হাশরের দিন কিয়ামতের ময়দানে আমার কি অবস্থা হবে, সে বিষয়ে চিন্তা করে আমি উদ্বিগ্ন ও হতাশাগ্রস্ত। দুনিয়ার আরাম-আয়েশ ও ইয্যত-সম্মানের পর জানিনা কবরের ঘোর অন্ধকারে একাকী কি অবস্থায় আমাকে কাটাতে হবে। আমি অতি উত্তমরূপে ধ্যান করেছি,—যখন আমলনামা হস্তান্তর করা হবে, তখন না-জানি আমার কি দুর্দশা হয়। আয় আল্লাহ্! আয় পরওয়ারদিগার!! একমাত্র আপনার উপরই আমার ভরসা আমার আশা ; আপনার দয়া ও রহমত ছাড়া আমার কোন গত্যন্তর নাই; মেহেরবানী করে আপনি আমাকে সেদিন মা'ফ করে দিন।'

'উয়ূনুল-আখবার' গ্রন্থে হযরত শাকীক বল্‌খী (রহঃ) থেকে উদ্ধৃত হয়েছে, তিনি বলেছেন ঃ 'তিনটি বিষয় এমন রয়েছে, মানুষ মুখে মুখে যেগুলোর খুব বুলি আওড়িয়ে থাকে ; কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিপরীত লক্ষ্য করা যায়, এক,— মানুষ মুখে স্বীকারোক্তি করে যে, আমরা আল্লাহ্‌র বান্দা, একমাত্র তাঁরই দাস ; কিন্তু কার্যতঃ দেখা যায় যে, প্রতিটি কাজে আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা ও স্বেচ্ছাচারিতা অবলম্বন করে থাকে। দুই,— মানুষ বলে থাকে, আল্লাহ আমাদের জীবিকা ও রোযী-রোযগারের জিম্মাদার, সুতরাং তিনিই এ ব্যাপারে ফিকির করবেন। কিন্তু একথা বলা সত্ত্বেও বাস্তব ক্ষেত্রে মানুষের অন্তর কখনও দুনিয়ার ধন-সম্পদ ব্যতিরেকে পরিতৃপ্ত হয় না, সর্বদা দুনিয়ার মোহে আচ্ছন্ন থাকে এবং ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার মাল-সামান একত্রিকরণে উন্মত্ত থাকে। তিন,— মানুষ বলে থাকে, মৃত্যু আসবেই এবং এটা সকলের জন্য অবধারিত ; কিন্তু তাদের ব্যস্ততা এবং দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণ দেখে মনে হয় যে, তারা কোনদিন মরবে না।' প্রিয় সাধক! একটু চিন্তা করে দেখ, মহান আল্লাহর দরবারে তুমি কোন্ দেহটি নিয়ে হাজির হবে, কোন্ মুখে তুমি কথা বলবে? মহান সেই দরবারের প্রতিটি জিজ্ঞাসার সঠিক জওয়াব তোমাকে দিতে হবে, যা পূর্বাহ্নেই প্রস্তুত করে রাখা চাই। মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ্ রাব্বুল-আলামীনের ভয় থেকে এক মুহূর্তের জন্যেও শঙ্কামুক্ত হয়ো না; কারণ তিনি তোমার ভাল-মন্দ সবকিছু সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত। আল্লাহ্ তা'আলার প্রতিটি নির্দেশকে আন্তরিক আনুগত্য সহকারে পালন কর এবং নিজের জাহের -বাতেন, চিন্তা-ভাবনা, ধ্যান-ধারণা ও কাজ-কর্মে সর্বতোভাবে

এক আল্লাহ্‌র জন্যে নিবেদিতপ্রাণ হয়ে যাও।

হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, আরশের নীচে লেখা রয়েছে ঃ

انا مطيع من اطاعني و محب من احبني و مجيب من دعاني
و غافر لمن استغفرني -

'আমার অনুগত বান্দার প্রতি আমি অনুগ্রহ করে থাকি, যে আমাকে ভালবাসে আমি তাকে ভালবাসি, যে আমার কাছে প্রার্থনা করে আমি তাকে দান করি এবং যে আমার কাছে ক্ষমা চায় আমি তাকে ক্ষমা করি।'

অতএব মানবের কর্তব্য হচ্ছে, ইখলাস ও পূর্ণ আনুগত্যের সাথে কায়মনোবাক্যে আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগীতে নিমগ্ন হওয়া, দুনিয়ার বালা-মুসীবত ও দুঃখ-দৈন্যে ছবর করা, আল্লাহর দেওয়া নে'আমতসমূহের শোকর আদায় করা এবং সর্বাবস্থায় মাওলার প্রতি সন্তুষ্ট ও উদগ্রীব থাকা। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ 'যে ব্যক্তি আমার অভিপ্রায়ে সন্তুষ্ট থাকে না, আমার যাচাই ও পরীক্ষায় ছবর করে না, আমার নে'আমতের শোকর আদায় করে না এবং আমার পরিমিত দানে তুষ্ট থাকে না, সে যেন আমাকে ছাড়া অন্য কোন প্রভু তালাশ করে।'

এক ব্যক্তি হযরত হাসান বসরী (রহঃ)-এর নিকট আরজ করলো, 'হুযুর! আমি ইবাদতে স্বাদ পাই না ; এর কারণ কি?' তিনি বললেন ঃ 'হয়তঃ তুমি এমন কোন লোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করেছো, যার অন্তরে আল্লাহ্‌র ভয় নাই।' জেনে রাখ,— 'ইবাদত হচ্ছে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য সবকিছুকে পরিপূর্ণরূপে ত্যাগ করার নাম ; এমনকি ইবাদতে স্বাদ অন্বেষণ করাও ইবাদতের পরিপন্থী কাজ।' জনৈক ব্যক্তি হযরত আবূ ইয়াযীদ (রহঃ)-এর নিকট ইবাদতে স্বাদ না-পাওয়ার কথা উল্লেখ করলে তিনি বলেছিলেন ঃ 'তুমি তো আল্লাহ্‌র ইবাদত না-করে 'ইতা'আত ও আনুগত্য' নামের বস্তুটির পূঁজা করছো, নতুবা তুমি ইবাদতে স্বাদ অন্বেষণ করছো কেন? বস্তুতঃ আল্লাহুর আনুগত্যের উদ্দেশে ইবাদত করাটাও এক প্রকার গায়রুল্লাহ্‌র ইবাদত। সুতরাং তুমি সকল গায়রুল্লাহ্ থেকে মুক্ত-পবিত্র হয়ে এক আল্লাহ্‌র ইবাদতে মগ্ন হও। তা'হলে অবশ্যই

তুমি স্বীয় আরাধনায় স্বাদ ও লজ্জত অনুভব করতে পারবে।

একদা এক ব্যক্তি নামায আরম্ভ করে যখন إِيَّاكَ نَعْبُدُ ('হে আল্লাহ্! আমি একমাত্র আপনারই ইবাদত করছি।') পর্যন্ত পৌঁছলো, তখন তার মনে ধারণার উদ্রেক হলো যে, 'সে প্রকৃতই আল্লাহ্ তা'আলার যথার্থ ইবাদত করছে।' তৎক্ষণাৎ গায়েব থেকে আওয়ায আসলো,—'তুমি মিথ্যুক ; তুমি আল্লাহ্র ইবাদত করছো না ; বরং রিয়া বা লোকদেখানোর উদ্দেশে এরূপ আরম্ভ করছো।' একথা শুনে সে তৎক্ষণাৎ তওবা করে নির্জন স্থানে গিয়ে নামায আরম্ভ করলো। এবারও যখন إِيَّاكَ نَعْبُدُ পাঠ করলো, তখন আওয়ায আসলো,—'তুমি মিথ্যুক, তুমি তোমার ধন-সম্পদের ইবাদত করছো।' অতঃপর সে নিজের সমস্ত ধন-দৌলত আল্লাহ্র রাস্তায় দান করে দিল এবং পুনরায় নামায আরম্ভ করলো। পূর্বের মত এবারও আওয়ায আসলো,—'তুমি তোমার পোষাক-পরিচ্ছদের ইবাদত করছো।' অতঃপর সে নিতান্ত প্রয়োজনীয় পোষাকাদি ছাড়া অবশিষ্ট সমস্ত কাপড়-চোপড় দান করে দিল। এরপর পুনরায় নামায আরম্ভ করে إِيَّاكَ نَعْبُدُ পর্যন্ত পৌঁছলে গায়েবী আওয়ায আসলো,—'হে আমার বান্দা! এবার তুমি সত্য বলছো ; প্রকৃতই তুমি একমাত্র আমারই ইবাদত করছো।'

'রাওনাক্বুল-মাজালিস' কিতাবে আছে,—'একদা এক ব্যক্তির মূল্যবান একটি বস্তু হারিয়ে যায় ; কে নিয়েছে বা কোথায় আছে, তার স্মরণ ছিল না। অতঃপর একবার নামাযে দণ্ডায়মান অবস্থায় বিষয়টি তার স্মরণ হয়। নামায সমাপ্ত করে গোলামকে সে বললো,—'অমুক ব্যক্তির নিকট হতে আমার সেই বস্তুটি নিয়ে আস।' একথা শুনে গোলাম জিজ্ঞাসা করলো, বিষয়টি আপনার কখন স্মরণ হয়েছে? সে বললো,—'নামাযে।' গোলাম বললো,—'হে মনিব! সত্য বলতে কি, নামাযরত অবস্থায় আপনি খোদার উপাসক ছিলেন না ; বরং সে বস্তুটির অন্বেষী ছিলেন। মনিব গোলামের মুখে এহেন বিজ্ঞজনোচিত উক্তি শুনে আনন্দিত হয়ে তাকে আযাদ করে দিল।'

হে সাধক! দুনিয়ার সর্ববিধ মায়া-মোহ পরিত্যাগ করে একমাত্র ইবাদত ও আনুগত্যে নিমগ্ন হয়ে যাও, সর্বদা অন্তকরণকে সুস্থ, সবল ও সুন্দর করার চেষ্টায় নিরত থাক, কঠোর পরিশ্রম ও সাধনা করে সম্মুখে অগ্রসর

হও এবং পারলৌকিক জীবনের সাফল্যকেই একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হিসাবে গ্রহণ করে নাও। প্রকৃত চিন্তাশীল ও বুদ্ধিমান লোক এ বিষয়ে কোনরূপ অবহেলা প্রদর্শন করতে পারে না। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন ঃ

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْاٰخِرَةِ نَزِدْ لَهٗ فِيْ حَرْثِهٖ ۚ وَمَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا ۙ وَمَا لَهٗ فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ نَّصِيْبٍ ۝

'যে ব্যক্তি পরকালের ফসল কামনা করে, আমি তার জন্য সেই ফসল বাড়িয়ে দেই। আর যে ইহকালের ফসল কামনা করে, আমি তাকে দুনিয়ার কিছু দিয়ে দেই ; কিন্তু পরকালে তার কোন অংশ থাকবে না।' (শূরা ঃ ২০)

আয়াতে উল্লেখিত 'হার্সুদ্দুন্য়া'-এর অর্থ হচ্ছে,—দুনিয়ার যাবতীয় ভোগ্য উপকরণ, যথা ঃ লেবাস-পোষাক, খাদ্য-পানীয় প্রভৃতি। 'এ ব্যক্তি আখেরাতের কোন অংশ পাবে না'-এর অর্থ হচ্ছে,—দুনিয়াতেই তার অন্তর থেকে আখেরাতের মহব্বত দূর হয়ে যায়। হযরত আবু বকর (রাযিঃ)-এর জীবনালেখ্যে লক্ষ্য করা যায় যে, আখেরাতের প্রতি সনিষ্ঠ আকর্ষণের ফলশ্রুতিতেই তিনি দ্বীনের খেদমতের জন্য চল্লিশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা গোপনে আর চল্লিশ হাজার প্রকাশ্যে সর্বমোট আশি হাজার স্বর্ণমুদ্রা আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করেছেন। অতঃপর নিজের জন্য তাঁর কাছে আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না।

দু'জাহানের সরদার হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পরিবারবর্গ সর্বদা দুনিয়ার সর্বপ্রকার আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাস পরিহার করে চলতেন। আদরের দুলালী মা ফাতেমা যাহ্রা (রাযিঃ)-কে তিনি বিবাহের সময় যে উপহার দিয়েছিলেন, তা ছিল নিতান্ত নগণ্য—চামড়ার একটি ছোট মোশক এবং খেজুরবৃক্ষের আঁশ দিয়ে প্রস্তুত করা একটি বালিশ মাত্র।

অধ্যায় ঃ ৭

খোদাবিমুখতা ও মুনাফেকী

একদা জনৈকা মহিলা হযরত হাসান বসরী (রহঃ)–এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বললো ঃ কিছুদিন হয় আমার একটি যুবতী কন্যা মারা গেছে, সেজন্যে আমার হৃদয় ভারাক্রান্ত ; আপনি আমাকে এমন কোন তদ্‌বীর বলে দিন, যদ্দ্বারা আমি তাকে স্বপ্নে দেখতে পারি।' অতঃপর হযরত হাসান বসরী (রহঃ) তাকে তদ্‌বীর বাৎলিয়ে দিলেন। মহিলাটি সে অনুযায়ী আমল করার পর একদিন স্বপ্নে দেখে যে, তার কন্যা আলকাতরার পোষাক পরিহিতা, গলায় লোহার জিঞ্জীর এবং পায়ে বেড়ী লাগানো অবস্থায় রয়েছে। মহিলা একথা হযরত হাসান বসরীকে জানালে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত ও চিন্তান্বিত হলেন। এভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর হযরত হাসান বসরী নিজে সেই কন্যাকে স্বপ্নে দেখেন যে, সে বেহেশ্‌তে পদচারণ করছে এবং তার মাথায় বেহেশ্‌তী তাজ। তখন সে হযরত হাসান বসরীকে বললো ঃ 'হে হাসান! আপনি আমাকে চিনতে পারেন নাই? আমি সেই মহিলার কন্যা, যে আমাকে স্বপ্নে দেখার জন্য আপনার নিকট হতে তদ্‌বীর নিয়েছিল।' তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার অবস্থা তো পূর্বে এরূপ ছিল না ; কিভাবে তোমার পূর্বাবস্থা পরিবর্তন হয়ে গেল এবং তুমি এ পর্যায়ে উন্নীত হলে—এর কারণ কি?' সে বললো ঃ 'এর কারণ হচ্ছে এই যে, একদা এক ব্যক্তি আমার কবরের পার্শ্ব দিয়ে পথ অতিক্রম করার সময় হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করেছে। তখন কবরস্থানে পাঁচ ব্যক্তির উপর গোর আযাব হচ্ছিল। সেই পথিক লোকটির দরূদ পড়ার পর আমরা একটি আওয়ায শুনতে পেলাম, তাতে বলা হচ্ছে,—'এই ব্যক্তির বরকতে এদের উপর থেকে কবরের আযাব উঠিয়ে নাও।' অতঃপর তৎক্ষণাৎ আমাদের আযাব বন্ধ হয়ে গেল।' এখানে প্রণিধানযোগ্য যে, একজন পথিকের একবার দরূদ শরীফ পাঠ করার ওসীলায় অপর লোকজন চিরকালের জন্য যদি ক্ষমা পেতে পারে, তা'হলে যে ব্যক্তি স্বয়ং পঞ্চাশ

বছর পর্যন্ত দরূদ শরীফ পাঠ করবে সে কি আল্লাহ্‌র রাসূলের শাফা'আত লাভে ধন্য হবে না? আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللّٰهَ

'তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা আল্লাহ্‌কে ভুলে গেছে।' (হাশর ঃ ১৯) অর্থাৎ, ওইসব কপট ও মুনাফেকদের মত হয়ো না, যারা আল্লাহ্ তা'আলার হুকুম–আহ্‌কামকে পরিত্যাগ করেছে এবং তাঁর দেওয়া বিধানাবলীর বিপরীত পন্থা অবলম্বন করে পার্থিব লোভ–লালসা ও মায়া–মোহে নিমজ্জিত হয়ে গেছে।

হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খাঁটি মু'মিন ও মুনাফিকদের লক্ষণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছেন ঃ 'প্রকৃত মু'মিন সর্বদা আমল–ইবাদত ও নামায–রোযা প্রভৃতি পুণ্যকার্যে নিমগ্ন থাকে আর মুনাফিক সর্বদা চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় পানাহার ও উদরপূর্তির চিন্তা–ধান্দায় মত্ত থাকে। মুনাফিক ব্যক্তি নামায ও ইবাদত পরিত্যাগকারী হয়, আর মু'মিন ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান–খয়রাত করে এবং সর্বদা আল্লাহ্‌র কাছে স্বীয় কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। মুনাফিক ব্যক্তি পার্থিব ধন–সম্পদের প্রতি লোভী ও উচ্চাভিলাষী হয়, আর মু'মিন ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো কাছে কিছু আশা করে না ; বরং সমস্ত মখ্‌লূক থেকে মু'মিন ব্যক্তি অনপেক্ষ থাকে। মুনাফিক ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে ছাড়া আর সকলের কাছেই আশা পোষণ করে থাকে। মু'মিন ব্যক্তি স্বীয় দ্বীন ও ঈমানকে ধন–সম্পদের উপর প্রাধান্য দেয়। আর মুনাফিক ব্যক্তি ধন–সম্পদকে দ্বীন ও ঈমানের উপর প্রাধান্য দেয়। মু'মিন ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহ্‌কে ভয় করে এবং সমস্ত গায়রুল্লাহ্ থেকে নির্ভীক থাকে, আর মুনাফিক ব্যক্তি সকল গায়রুল্লাহ্‌কে ভয় করে এবং একমাত্র আল্লাহ্ থেকে নির্ভীক থাকে। মু'মিন ব্যক্তি নেক আমল করা সত্ত্বেও আল্লাহ্‌র ভয়ে রোদন করে, আর মুনাফিক পাপকার্যে লিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও আনন্দ–উল্লাসে মত্ত থাকে। মু'মিন ব্যক্তি নির্জনতা ও একাকীত্ব পছন্দ করে আর মুনাফিক জনকোলাহল ও অবাধে মিলামিশা পছন্দ করে। মু'মিন ব্যক্তি আমল ও ইবাদতরূপ শস্যক্ষেত্রকে আবাদ করা সত্ত্বেও যেকোন মুহূর্তে তা' ধ্বংস হয়ে যাওয়ার আশংকা পোষণ করে। পক্ষান্তরে মুনাফিক আমলের

শস্যক্ষেত্রকে সর্বদা উজাড় করা সত্ত্বেও তা' থেকে ফসলপ্রাপ্তির আশা করতে থাকে। মু'মিন ব্যক্তি দ্বীন ও ঈমানের হিফাযত ও আমলের ইস্‌লাহের উদ্দেশে সৎ কাজে আদেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধ করে থাকে, আর মুনাফিক ব্যক্তি স্বীয় প্রভাব বিস্তার ও ফেতনা সৃষ্টির উদ্দেশে আদেশ-নিষেধ করে থাকে ; বরং সে অসৎ ও অন্যায় কাজে আদেশ ও সহযোগিতা করে এবং সৎ ও ন্যায় কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখে।' যেমন আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন ঃ

الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ○ وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ ○

'মুনাফিক নর-নারী সবারই গতিবিধি এক রকম ; শিক্ষা দেয় মন্দ কথা, ভাল কথা থেকে বারণ করে এবং নিজ মুঠো বন্ধ রাখে। আল্লাহ্‌কে ভুলে গেছে তারা, কাজেই তিনিও তাদের ভুলে গেছেন। নিঃসন্দেহে মুনাফিকরাই না-ফরমান। ওয়াদা করেছেন আল্লাহ্ তা'আলা মুনাফিক পুরুষ, মুনাফিক নারী এবং কাফেরদের জন্যে দোযখের আগুনের ; তাতে পড়ে থাকবে সর্বদা। সেটাই তাদের জন্যে যথেষ্ট। আর আল্লাহ্ তাদের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন এবং তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী আযাব।' (তওবা ঃ ৬৭,৬৮)

অন্য এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে ঃ

إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ○

'আল্লাহ্ দোযখের মাঝে মুনাফিক ও কাফেরদেরকে একই জায়গায় সমবেত করবেন।' (নিসা ঃ ১৪০)

অর্থাৎ,—এসব লোক কুফর ও মুনাফেকীর কারণে মৃত্যুর পর জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মুনাফিকদের কথা পূর্বে উল্লেখ করেছেন,—এর কারণ হচ্ছে যে, এরা কাফেরদের চাইতেও জঘন্য ও নিকৃষ্ট এবং এদের উভয়ের পরিণতিই হবে জাহান্নাম। যেমন ইরশাদ হয়েছে ঃ

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ○

'নিঃসন্দেহে মুনাফিকদের স্থান হচ্ছে, দোযখের সর্বনিম্ন স্তরে। আর তুমি, তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী পাবে না।' (নিসা ঃ ১৪৫)

অভিধানে 'মুনাফিক' শব্দটি 'নাফেক্বাউল-ইয়ারবু' অর্থাৎ 'বন্য ইঁদুরের গর্ত' থেকে নির্গত। কথিত আছে, বন্য ইঁদুরের গর্তে দু'টি ছিদ্রপথ থাকে; আরবী ভাষায় একটিকে 'নাফেকা' এবং অপরটিকে 'কাছে'আ' বলা হয়। এসব বন্য ইঁদুরের অভ্যাস হলো, এক ছিদ্রপথে নিজেকে প্রকাশ করে এবং অন্য গোপন ছিদ্রপথ দিয়ে বের হয়ে যায়। অনুরূপ, মুনাফিক ব্যক্তিও বাহ্যতঃ নিজকে মুসলমান হিসাবে প্রকাশ করে থাকে ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইসলাম থেকে বের হয়ে কুফ্‌রের দিকে চলে যায়। এজন্যেই তাকে 'মুনাফিক' নামে অভিহিত করা হয়েছে।

হাদীস শরীফে আছে ঃ

مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ الشَّاةِ تَرَى بَيْنَ قَطِيعَيْنِ مِنَ الْغَنَمِ تَارَةً تَسِيرُ إِلَى هَذَا الْقَطِيعِ وَتَارَةً إِلَى هَذَا الْقَطِيعِ وَلَا تَسْكُنُ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا لِأَنَّهَا غَرِيبَةٌ لَيْسَتْ مِنْهُمَا ـ

'মুনাফিক ব্যক্তির উদাহরণ হচ্ছে, দু'টি পালের মধ্যবর্তী অপরিচিত ছাগল বা মেষের মত। সে একবার এক পালে প্রবেশ করে আবার কিছুক্ষণ পর অপর পালে প্রবেশ করে ; কিন্তু উভয় পালের কাছেই সে অপরিচিত হওয়ার কারণে কেউ তাকে গ্রহণ করে না। অনুরূপ, মুনাফিক ব্যক্তিও না মুসলমানদের

কাছে অবস্থান করতে পারে, না কাফেরদের কাছে স্থান পায়।'

আল্লাহ্ তা'আলা জাহান্নামকে এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, তার সাতটি দরজা রয়েছে। কুরআনের ভাষায় ঃ

لَهَا سَبْعَةُ اَبْوَابٍ

'দোযখের সাতটি দরজা রয়েছে।' (হিজ্র ঃ ৪৪)

কাফেরদেরকে আল্লাহ্ তাআলার লা'নত ও অভিশাপ দিয়ে দোযখে নিক্ষেপ করে লোহার দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে। এর উপরের অংশে তামা এবং ভিতরে গলিত সীসা হবে। দোযখের অভ্যন্তরে ভয়াবহ শাস্তি ও আল্লাহ্র রোষ ও পরাক্রম বিরাজ করবে। দোযখের মাটি হবে উত্তপ্ত তামা, কাঁচ, লোহা ও সীসা দ্বারা গঠিত। দোযখে নিক্ষিপ্ত লোকদের উপরে, নীচে, ডানে, বামে, এক কথায় চতুর্দিক থেকে উপর্যুপরি অগ্নি বর্ষিত হবে। এর মধ্যে সর্বনিম্ন ও সর্বনিকৃষ্ট স্থানে অবস্থান হবে মুনাফিকদের।

বর্ণিত আছে, একদা হযরত জিব্রাঈল (আঃ) হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হলেন, আল্লাহ্র রাসূল তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ 'হে জিব্রাঈল! দোযখের অগ্নি এবং তার উত্তাপ সম্পর্কে আপনি কিছু বলুন।' হযরত জিব্রাঈল (আঃ) বললেন ঃ 'আল্লাহ্ তা'আলা দোযখের অগ্নি সৃষ্টি করে প্রথমে এক হাজার বৎসর পর্যন্ত দগ্ধ করেছেন ; ফলে তা' লালবর্ণ ধারণ করে। অতঃপর আরো এক হাজার বৎসর পর্যন্ত দগ্ধ করেছেন ; ফলে তা' শ্বেতবর্ণে রূপান্তরিত হয়। অতঃপর আরো এক হাজার বৎসর কাল জ্বালিয়েছেন ; ফলতঃ সেটা কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে এবং ঘন অন্ধকারে পরিণত হয়।' অতঃপর হযরত জিব্রাঈল (আঃ) বললেন ঃ 'আল্লাহ্ পাকের মহান সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্য নবী হিসাবে প্রেরণ করেছেন, যদি দোযখবাসীদের পরিধেয় একটি বস্ত্রখণ্ডও পৃথিবীতে নিক্ষেপ করা হয়, তবে জগতের সমস্ত মখ্লূক ধ্বংস হয়ে যাবে। অনুরূপ, যদি দোযখবাসীদের ছোট এক বালতি পরিমাণ পানীয় বস্তু দুনিয়ার সমগ্র পানিতে মিশ্রিত করা হয় ; তা'হলে যে ব্যক্তি এর সামান্য পরিমাণও পান করবে, সে তৎক্ষণাৎ মারা যাবে। এমনিভাবে, জাহান্নামে একটি শিকল রয়েছে, কুরআনের ভাষায় ঃ

فِىْ سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا ۝

'তাকে শৃঙ্খলিত করা হবে সত্তর গজ দীর্ঘ এক শিকলে।' (আল-হাক্কাহ্ ৩২) - এর অর্থ গজের পরিমাণ দুনিয়ার পূর্ব প্রান্ত হতে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত দূরত্বের সমান। যদি এই শিকলকে পৃথিবীর পর্বতসমূহের উপর রাখা হয়, তা'হলে এই অগণিত পর্বত দ্রব-গলিতে পরিণত হবে। অনুরূপ, যদি কোন ব্যক্তি দোযখে প্রবেশের পর কোনক্রমে বের হয়ে পুণরায় দুনিয়াতে আগমন করে, তা'হলে সমগ্র জগতবাসী সেই ব্যক্তির দুর্গন্ধে অসহ্য হয়ে মারা যাবে।'

অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত জিব্রাঈল (আঃ)-কে দোযখের দরজাসমূহের অবস্থা বর্ণনা করতে বললেন ; অর্থাৎ সেটা কি আমাদের ঘর-বাড়ীর দরজার মত, না অন্য কোনরূপ? হযরত জিব্রাঈল (আঃ) বললেন ঃ 'হে আল্লাহ্র রাসূল! দোযখের দরজা এই পৃথিবীর ঘর-বাড়ীর দরজার মত নয় ; বরং তা' উপরে-নীচে স্তরে-স্তরে বিন্যস্ত এবং নিম্নদিক থেকে এক দরজা হতে অপর দরজা পর্যন্ত সত্তর বছরের পথ পরিমাণ দূরত্ব। উপরের দিক থেকে প্রথম দরজার তুলনায় দ্বিতীয়টির এবং এভাবে পরবর্তী দরজাগুলোর একটির তুলনায় অপরটির উত্তাপ ও দাহন ক্ষমতা সত্তর গুণ অধিক হবে।' অতঃপর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসব স্তরে অবস্থানকারীদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে হযরত জিব্রাঈল (আঃ) বললেন যে, দোযখের সর্বনিম্ন তলায় নিক্ষেপ করা হবে মুনাফিকদেরকে। এই স্তরের নাম হা'বিয়াহ্। এ স্তরে মুনাফিকদের অবস্থান প্রসঙ্গে আল্লাহ্ পাক পবিত্র কুরআনে বলেছেন ঃ

اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ

'নিঃসন্দেহে মুনাফিকদের স্থান হচ্ছে, দোযখের সর্বনিম্ন স্তরে।' (নিসা ঃ ১৪৫)

নিম্নদিক হতে দ্বিতীয় স্তরে হবে মুশরিকরা। এ স্তরের নাম 'জাহীম'। তৃতীয় পর্যায়ে মূর্তি-পূজকদের স্তর। এর নাম 'সাক্বার'। চতুর্থ পর্যায়ে অভিশপ্ত ইবলীস ও তার অগ্নিপূঁজক অনুচরদের স্তর। এর নাম 'লাজা'। পঞ্চম স্তরে

হবে ইহুদীরা ; এর নাম 'হুতামাহ্'। ষষ্ঠ স্তরে হবে খৃষ্টানরা ; এর নাম 'সাঈর'। এ পর্যন্ত বর্ণনা করে হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ) থেমে গেলেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ 'হে জিব্‌রাঈল! আপনি সপ্তম স্তর সম্পর্কে কিছু বলছেন না কেন?' হযরত জিব্‌রাঈল বললেন ঃ 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এই স্তর সম্পর্কে আপনি জানতে চাবেন না।' হুযুর বললেন ঃ 'না এ সম্পর্কেও আপনি বলে দিন।' অতঃপর হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ) আরজ করলেন ঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! জাহান্নামের এই সপ্তম স্তরে আপনার উম্মতের ওই সব লোক নিক্ষিপ্ত হবে, যারা দুনিয়াতে কবীরা গুনাহে লিপ্ত হয়েছে এবং তওবা না করে মারা গেছে।'

হাদীসে বর্ণিত আছে যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি যখন নিম্নের এ আয়াতটি নাযিল হয়েছে—

وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا ج

'তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নাই, যে তথায় পৌছবে না।'

(মার্‌য়াম ঃ ৭১)

তখন তাঁর পবিত্র অন্তর উম্মতের এই অসহায় অবস্থার কথা চিন্তা করে দুঃখ-বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল এবং অনেকক্ষণ পর্যন্ত তিনি কান্নাকাটি করেছিলেন। সুতরাং যারা আল্লাহ্‌র পরিচয়প্রাপ্ত এবং তাঁর অসীম ক্ষমতা ও পরাক্রমশীলতা সম্পর্কে পরিজ্ঞাত, তাদের উচিত, সর্বদা আল্লাহ্ তা'আলার ভয়-ভীতি ও ভক্তি-শ্রদ্ধা হৃদয়-মনে জাগরুক করে রাখা এবং প্রবৃত্তির তাড়না ও পাপাচারের জন্য তওবা ও অনুশোচনার অশ্রু বর্ষণ করা, যাতে শেষ পরিণামে এহেন ভয়াবহ আযাব-গজব ও মর্মন্তুদ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে না হয়, যার অনিবার্য ফলশ্রুতিতে হাশরের ময়দানে সকলের সম্মুখে অপমানিত হয়ে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্‌র হুকুমে দোযখে নিক্ষিপ্ত হতে হবে।

অগণিত এমন বহু বৃদ্ধ ধরাপৃষ্ঠে দিব্যি নিশ্চিন্তে পদচারণা করছে ; যাদের প্রতি দোযখ তার ভয়াবহ মূর্তি ধারণ করে প্রতিনিয়ত অভিশাপ ক্ষেপণ করছে। কত যুবক রয়েছে, দোযখ ডেকে ডেকে যাদের যৌবন ও তারুণ্যের প্রতি ধিক্কার দিচ্ছে। কত অগণিত নারী রয়েছে, দোযখ চিৎকার

করে যাদের উপর লা'নত ও লাঞ্ছনার গ্লানি বর্ষণ করছে এবং ক্ষণকাল পরে যাদের মুখমণ্ডল ঘৃণ্য সিয়াহ্ রূপ ধারণ করবে, পৃষ্ঠদেশ তাদের ভেঙ্গে পড়বে। সেই ভয়াবহ দিনে কোন মহামান্য সম্ভ্রান্তের প্রতিও সম্মান প্রদর্শন করা হবে না, কারও পাপ ও অন্যায়-অপরাধ গোপন থাকবে না।

হে আল্লাহ্! আমাদেরকে দোযখ থেকে, দোযখের শাস্তি থেকে এবং ওইসব আচরণ ও কার্যকলাপ থেকে রক্ষা করুন, যেগুলো আমাদেরকে দোযখের দিকে ঠেলে দিবে। আয় আল্লাহ্! আপনি অনুগ্রহ করে আমাদিগকে আপনার নেক বান্দাদের সাথে জান্নাতে দাখেল করে নিন ; আপনি মহা পরাক্রমশালী, অনন্ত মার্জনাকারী। ইয়া আল্লাহ্! আমাদের দাগ-দোষ গোপন করে রাখুন, আচ্ছাদিত করে রাখুন, আমাদেরকে ভয়, সন্ত্রাস ও দুশ্চিন্তা হতে মুক্ত রাখুন, আমাদের ভ্রম ও পদস্খলন মার্জনা করে দিন, ক্বিয়ামতের ময়দানে আপনার সম্মুখে লাঞ্ছনা ও অপমান থেকে রক্ষা করুন ; আপনি সর্বমহান, অনন্ত অনুগ্রহের মালিক।

অধ্যায় ঃ ৮

তওবা ও অনুতাপ

প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর উপর তওবা করা ওয়াজিব বা অপরিহার্য কর্তব্য। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন ঃ

تُوبُوا إِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا ط

'তোমরা আল্লাহ্র কাছে তওবা কর—আন্তরিক তওবা।'(তাহ্রীম ঃ ৮)

উক্ত আয়াতে আদেশ-বাচক পদ ব্যবহৃত হয়েছে বিধায় এ থেকে তওবার অপরিহার্যতাই প্রমাণিত হয়।

অন্য এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللّٰهَ

'তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা আল্লাহ্কে ভুলে গেছে।'
(হাশর ঃ ১৯)

অর্থাৎ,— যারা আল্লাহ্র সাথে ওয়াদা-অঙ্গীকার করেও তা' ভঙ্গ করেছে, তোমরা তাদের মত হয়ো না। কেননা ওয়াদা ভঙ্গ করার ফলে তাদের অবস্থা হয়েছে ঃ

فَأَنْسٰهُمْ أَنْفُسَهُمْ ط

'ফলে আল্লাহ্ তাদেরকে আত্মবিস্মৃত করে দিয়েছেন।' (হাশর ঃ ১৯)

অর্থাৎ,—নিজেদের সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণ বিস্মৃত ও উদাসীন হয়ে গেছে। ফলে, তারা স্বীয় জীবনের জন্য কল্যাণকর ও অকল্যাণকর বিষয়ের মধ্যে কোনই পার্থক্য করতে পারছে না এবং পারলৌকিক সাফল্যের জন্য কোন নেক আমল বা সৎকর্মে সক্রিয় হচ্ছে না। হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللّٰهِ أَحَبَّ اللّٰهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللّٰهِ كَرِهَ اللّٰهُ لِقَاءَهُ -

'যারা আল্লাহ্র দীদার ও সাক্ষাতে অনুরাগী, আল্লাহ্ও তাদের সাক্ষাতে আগ্রহী। পক্ষান্তরে, যারা আল্লাহ্র সাক্ষাতে অনাগ্রহী, আল্লাহ্ও তাদের সাক্ষাতে অনাগ্রহী।'

أُولٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُونَ ۝

'বস্তুতঃ এরাই হচ্ছে, ফাসেক।' (হাশর ঃ ১৯)

অর্থাৎ,— এরাই আল্লাহ্র অবাধ্য ও না-ফরমান বান্দা, আল্লাহ্র সাথে ওয়াদা-অঙ্গীকার করেও তারা তা' ভঙ্গ করেছে, আল্লাহ্র অনুগ্রহ, ক্ষমা ও সঠিক পথ-প্রাপ্তি হতে এরা বঞ্চিত।

বস্তুতঃ ফাসেক লোকদেরকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায় ঃ এক,— 'কাফের ফাসেক'। দুই,-'ফাজের ফাসেক' অর্থাৎ,—অবাধ্য মু'মিন।

'কাফের ফাসেক' বলতে ওই ব্যক্তিকে বুঝায়, যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়ন করে নাই ; বরং সম্পূর্ণরূপে হেদায়াত থেকে বঞ্চিত এবং গুমরাহী ও পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত। কুরআনুল করীমে ইরশাদ হয়েছে ঃ

فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهٖ ط

'সে (শয়তান) তার সৃষ্টিকর্তার নির্দেশকে অমান্য করেছে।'
(কাহ্ফ ঃ ৫০)

অর্থাৎ,—পরওয়ারদিগারের প্রতি ঈমান আনয়ন করার হুকুমকে পরিহার করে কুফর অবলম্বন করেছে। আর 'ফাজের ফাসেক' বলতে বুঝায়,— যে ব্যক্তি মদ্যপান করে, রিযিকের ব্যাপারে হালাল-হারামের কোন তমিজ করে না, ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, আল্লাহ্র না-ফরমানী ও অবাধ্যতায় মত্ত থাকে, আল্লাহ্র ইবাদত-বন্দেগী পরিহার করে পাপাচারে নিমগ্ন থাকে ; কিন্তু এ সবকিছু করা সত্ত্বেও সে কুফ্র ও শিরকে লিপ্ত হয় না।

উক্তরূপ দ্বিবিধ ফাসেকের মধ্যে পার্থক্য এই যে, ঈমান আনয়ন করে তওবা না করা পর্যন্ত হাজার অনুতাপ করলেও 'কাফের ফাসেক'-এর ক্ষমা ও মার্জনার আশা করা যায় না। পক্ষান্তরে, দ্বিতীয় প্রকার 'ফাজের ফাসেক' মৃত্যুর পূর্বে স্বীয় কৃতকর্ম হতে তওবা ও অনুশোচনায় ভারাক্রান্ত হলে, ক্ষমার আশা করা যায়। বস্তুতঃ লোভ-লালসা ও কাম-প্রবণতায় আক্রান্ত ব্যক্তির তওবা সহজেই নসীব হতে পারে ; কিন্তু অহংকার ও আত্মগৌরবের ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তির তওবা ও হিদায়াত সহজে নসীব হয় না। অতএব, তোমাকে সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে, যেন প্রতি মুহূর্তে আল্লাহ্র দরবারে তওবারত অবস্থায় থাকো,— তওবাহীন অবস্থায় মৃত্যু যেন তোমাকে গ্রাস করে না ফেলে। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُوْا عَنِ السَّيِّئَاتِ

'তিনি তাঁর বান্দাদের তওবা কবুল করেন এবং পাপসমূহ মার্জনা করেন।' (শূরা ঃ ২৫)

অর্থাৎ,—আল্লাহ্ তা'আলা এদের তওবা কবুল করে অতীতের সমস্ত গুনাহ্ ক্ষমা করে দেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَّا ذَنْبَ لَهُ

'গুনাহ্ থেকে তওবাকারী নিষ্পাপ ব্যক্তির ন্যায় পবিত্র।'

কথিত আছে, এক ব্যক্তি যখনই কোন পাপ করতো, তখন তা' একটি খাতায় লিপিবদ্ধ করে রাখতো (যাতে দ্বিতীয়বার এই পাপে লিপ্ত না হয়)। একদা সে কোন একটি পাপকর্মে লিপ্ত হওয়ার পর তা' লিপিবদ্ধ করার জন্য যখন খাতা খুললো তখন দেখতে পেল, পূর্বের লিপিবদ্ধ করা সবকিছু সম্পূর্ণ মুছে গেছে এবং তদস্থলে নিম্নের এই আয়াতটি লেখা রয়েছে ঃ

فَاُولٰئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنٰتٍ ط

'আল্লাহ্ তাদের (তওবাকারীদের) গুনাহ্কে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তিত করে দেন।' (ফুরক্বান ঃ ৭০)

অর্থাৎ,—সেই ব্যক্তির আন্তরিক তওবা ও অনুতাপের বরকত ও কল্যাণে শিরকের স্থলে ঈমান, ব্যভিচারের স্থলে ক্ষমা, অবাধ্যতা ও না-ফরমানীর স্থলে আনুগত্য ও গুনাহ্ থেকে হিফাযতের সওগাত এসে গেছে।

একদা আমীরুল-মু'মেনীন হযরত উমর (রাযিঃ) মদীনার একটি গলিপথ অতিক্রম করছিলেন। এ সময় একজন যুবকের প্রতি তাঁর দৃষ্টি পড়ে। যুবকটি তার পরিহিত কাপড়ের নীচে একটি বোতল লুকিয়ে রেখেছিল। হযরত উমর জিজ্ঞাসা করলেন ঃ 'ওহে যুবক! তুমি কাপড়ের অভ্যন্তরে এটা কি লুকিয়ে রেখেছো?' আসলে সেই বোতলটিতে মদ রক্ষিত ছিল। তাই, সে হযরত উমরের জিজ্ঞাসার জওয়াব দিতে লজ্জা ও অপমান বোধ করছিল। তখন সে অন্তরে-অন্তরে আল্লাহ্র নিকট অনুশোচনায় ভারাক্রান্ত হয়ে দো'আ করলো— 'আয় আল্লাহ্! আমাকে হযরত উমরের সম্মুখে লজ্জিত ও অপমানিত করো না, তাঁর কাছে আমার দোষ ও অপরাধকে গোপন করে রাখ, আমি তওবা করছি এবং ওয়াদা করছি যে, জীবনে আর কখনও মদ্য পান করবো না।' তারপর এই যুবক হযরত উমরের জিজ্ঞাসার জওয়াবে বললো ঃ 'হে আমীরুল-মু'মেনীন! আমি সির্কার বোতল বহন করে নিয়ে যাচ্ছি।' অতঃপর হযরত উমর (রাযিঃ) বোতলটি দেখতে চাইলেন। আমীরুল-মু'মেনীনের অভিপ্রায় অনুযায়ী যুবক যখন বোতলটি তাঁর সম্মুখে পেশ করলো, তখন তিনি দেখতে পেলেন যে, বোতলটিতে সত্যসত্যই সির্কা রয়েছে।

প্রিয় সাধক! এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে, একজন মাখ্লুক অপর একজন মাখ্লুকের সম্মুখে লজ্জা ও অপমানের ভয়ে তওবা করেছে, তথাপি আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর অনুতাপ কবূল করে মদ্যকে সির্কায় পরিণত করে দিয়েছেন। বস্তুতঃ এ ক্ষেত্রে সে আন্তরিক ইখলাস ও ঐকান্তিক নিষ্ঠার সাথে সত্যিকারের তওবা করেছিল, এরই ফলশ্রুতিতে সে কবূলিয়তের নে'আমতে ভূষিত হয়েছে। ঠিক এভাবেই যদি পাপাচার ও অবাধ্যতার দরুণ বিধ্বস্ত কোন বান্দা নিষ্ঠা ও ইখলাসের সাথে কায়মনোবাক্যে আল্লাহ্র দরবারে তওবা করে এবং স্বীয় অতীত কৃতকর্মের জন্য অনুতাপ ও অনুশোচনায় জর্জরিত হয়, তা'হলে অবশ্যই তিনি তা' কবুল করে নিবেন এবং পাপাচারের মদ্যকে নেকী ও সৎকর্মের সির্কায় পরিবর্তন করে দিবেন।

হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) বলেন ঃ 'একদা হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে জামাতে ইশা'র নামায আদায় করার পর আমি বাহিরে বের হলাম ; এমন সময় একজন মহিলা পথে দণ্ডায়মান হয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করলো ঃ—'হে আবূ হুরাইরাহ্! আমি গুনাহ্ করেছি ; পাপে লিপ্ত হয়েছি, আমার জন্য কি তওবা ও পাপ মোচনের কোন উপায় আছে?' আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি যে পাপটি করেছো তা' কি? সে বললো,- 'আমি ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছি এবং আমার এই দুষ্কর্মের ফলে যে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে, তাকেও হত্যা করে ফেলেছি।' অতঃপর আমি তাকে বললাম— 'তুমি নিজেও ধ্বংস হয়েছো এবং অপর একটি নিষ্পাপ সন্তানকেও ধ্বংস করেছো! আল্লাহ্র কসম, এহেন পাপকার্যের পর তোমার জন্য কোন তওবা নাই। একথা শুনে মহিলাটি অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। তাকে এভাবেই রেখে আমি সেখান থেকে চলে গেলাম। কিন্তু অন্তরে-অন্তরে চিন্তা করতে লাগলাম—মহিলার প্রশ্নের উত্তর তো আমি দিয়ে দিলাম ; কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও বিষয়টি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম না। অতঃপর আমি হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র খেদমতে উপস্থিত হয়ে বিষয়টি খুলে বললাম। আমার বিবরণ শুনে হুযূর (সঃ) বললেনঃ 'হে আবূ হুরাইরাহ্! তুমি নিজেও ধ্বংস হলে এবং অপরকেও ধ্বংস করলে। তুমি কি কুরআনের এ আয়াতটি তিলাওয়াত কর নাই?

وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ..... فَاُولٰٓئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنٰتٍ ط

'এবং যারা আল্লাহ্র সাথে অন্য উপাস্যের ইবাদত করে না আল্লাহ্ তাদের পাপসমূহকে পুণ্যের দ্বারা পরিবর্তিত করে দেন।'

(ফুরক্বান ঃ ৬৮,৬৯,৭০)

অর্থাৎ,—শিরক ও কুফর ত্যাগ করে পাপাচার হতে তওবা ও অনুতাপ করলে আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার কৃতগুনাহ্কে নেকীর দ্বারা পরিবর্তন করে দেন। এটা মহান আল্লাহ্ রাব্বুল-আলামীনের রহমত ও অনুগ্রহ। (হযরত আবূ হুরাইরাহ্ বলেন ঃ) অতঃপর আমি চরম হতাশ ও উদ্বিগ্ন হয়ে সেই মহিলাকে এমনভাবে তালাশ করতে লাগলাম যে, লোকেরা আমাকে উন্মাদ বলতে লাগলো। অবশেষে আমি তাকে খুঁজে বের করতে সমর্থ হয়েছি। তারপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক বিবৃত সঠিক মাসআলা সম্পর্কে আমি তাকে অবহিত করি। তাতে সে আনন্দের আতিশয্যে সজোরে হেসে উঠলো এবং একটি বাগান আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রাসুলের জন্য ওয়াক্ফ করে দিল।'

উত্বাহ নামক এক নওজওয়ান অনাচার, ব্যভিচার ও মদ্যপানে অভ্যস্ত ছিল। এহেন পাপকার্যের জন্য সে সমাজে ঘৃণ্য ও কুখ্যাত ছিল। একদা হযরত হাসান বসরী (রহঃ)-এর মজলিসে সে উপস্থিত হয়। তখন তিনি নিম্নের এই আয়াতটির তাফসীর প্রসঙ্গে ওয়াজ করছিলেন ঃ

اَلَمْ يَاْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ

'যারা মু'মিন, তাদের জন্যে কি আল্লাহ্র স্মরণে বিগলিত হওয়ার সময় আসে নাই।' (হাদীস ঃ ১৬)

হযরত হাসানের অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ও মর্মস্পর্শী ওয়াজে তন্ময় হয়ে শ্রোতামণ্ডলী কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছিল। এমন সময় জনৈক যুবক দাঁড়িয়ে হযরত হাসান বসরীকে উদ্দেশ্য করে বললো—'হে আল্লাহ্র প্রিয় বান্দা! আমি একজন জঘন্য পাপী, আমার মত জঘন্য না-ফরমান বান্দার তওবা কি আল্লাহ্ তা'আলা কবূল করবেন? উত্তরে হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বললেন ঃ 'অবশ্যই তোমার অবাধ্যতা ও পাপাচার সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'আলা তোমার তওবা কবূল করবেন।' হাসান বসরীর এই উত্তর শুনে মজলিসে উপবিষ্ট নওজওয়ান উত্বার মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়ে গেল, সম্পূর্ণ দেহ তার কাঁপতে আরম্ভ করলো, চিৎকার করতে করতে সে মূর্ছিত হয়ে মাটিতে ঢলে পড়লো। জ্ঞান ফিরে আসার পর হযরত হাসান তার নিকটবর্তী হলেন এবং কয়েকটি পংক্তি আবৃত্তি করলেন, যেগুলোর সারমর্ম হচ্ছে ঃ 'ওহে না-ফরমান যুবক! মহা আরশের মালিক আল্লাহ্ তা'আলার অবাধ্যতার শাস্তি কি? সে সম্পর্কে তুমি অবশ্যই অবগত,— তোমাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, যেখানে থাকবে ক্রুদ্ধ গর্জন, রোষভরে গ্রেফতার করে হেঁচড়িয়ে তোমাকে সেই ভয়াবহ

অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হবে! তুমি যদি সেই অগ্নিকুণ্ডে প্রজ্জ্বলিত হওয়ার ক্ষমতা রাখো, তা'হলে না-ফরমানী কর। নতুবা এখনই বিরত হয়ে যাও। বস্তুতঃ তুমি পাপাচারে লিপ্ত হয়ে নিজেকে শয়তান ও কু-প্রবৃত্তির বেড়াজালে আবদ্ধ করে ফেলেছো; এখনও সময় আছে, পরিত্রাণের চেষ্টা কর।' পংক্তিগুলো শ্রবণ করার পর যুবক উত্‌বাহ পুনরায় চিৎকার দিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়লো। এবার জ্ঞান ফিরে আসার পর সে বলতে লাগলো—'হে শায়খ! আমার মত বদ্‌নসীব ও গুনাহ্‌গার বান্দার তওবাও কি আল্লাহ্ তা'আলা কবূল করবেন?' হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বললেন ঃ 'হাঁ, অবশ্যই কবূল করবেন।' অতঃপর নওজওয়ান উত্‌বা মাথা উঠিয়ে নিম্নোক্ত তিনটি দো'আ করলো ঃ 'এক,— হে আল্লাহ্! আপনি যদি দয়া করে আমার তওবা কবূল করেন, এবং আমার পাপরাশি ক্ষমা করে দেন, তা'হলে আমাকে তীক্ষ্ণ উপলব্ধি, প্রখর ধীশক্তি ও প্রচুর স্মরণশক্তি দান করুন, যাতে উলামায়ে-কেরাম থেকে শ্রুত সর্ববিধ ইল্‌ম ও কুরআনী জ্ঞান আমি সংরক্ষণ করতে পারি। দুই,—আয় আল্লাহ্! আমাকে মনমুগ্ধকর কণ্ঠস্বর দান করুন, যাতে যেকোন পাষাণহৃদয় ব্যক্তিও আমার কুরআন তিলাওয়াত শুনে আকৃষ্ট ও বিনয়াবনত হয়। তিন,—আয় আল্লাহ্! আমাকে হালাল রিযিক দান করুন এবং কল্পনাতীতভাবে আমাকে সাহায্য করুন।'

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল-আলামীন যুবকের তিনটি দো'আই কবূল করে নিলেন। ফলে, তার মেধা অত্যন্ত তীক্ষ্ণ হয়েছিল, তার কুরআন তিলাওয়াত শুনে যে কোন কঠিন হৃদয় মানুষও তওবা করতো। প্রতিদিন তার গৃহে দু'টি রুটি এবং এক পেয়ালা তরকারী পৌঁছিয়ে দেওয়া হতো ; কিন্তু এ খাদ্য কোত্থেকে কিভাবে আসছে, কে-ই বা প্রত্যহ তা' পৌঁছিয়ে দিয়ে যাচ্ছে, সে সম্পর্কে যুবক কিছুই বলতে পারতো না। এ অবস্থা তার মৃত্যু পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। প্রিয় সাধক! উক্ত নওজওয়ানের মত যে কোন ব্যক্তি আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার সাথে সেই ব্যবহারই করবেন, যা এই নওজওয়ানের সাথে করেছেন। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা কারো নেক আমল কখনও ধ্বংস হতে দেন না।

একদা জনৈক তত্ত্বজ্ঞানী আলেমকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল,— 'কোন তওবাকারী ব্যক্তি যদি জান্‌তে চায় যে, তার তওবা আল্লাহ্‌র দরবারে কবূল

হয়েছে কিনা, তা'হলে এর কোন উপায় আছে কি?' তিনি বলেছিলেন ঃ 'এ বিষয়ে পূর্ণ নিশ্চয়তা সহকারে যদিও কিছু বলা যায় না ; তবুও তওবা কবূলের কিছু লক্ষণ আছে। যথা ঃ তওবা ও অনুতাপের পর বান্দা সর্বদা পাপমুক্ত থাকবে, অযথা আনন্দ-উল্লাস থেকে বিরত থাকবে, অন্তকরণকে আধ্যাত্মিক ব্যাধি হতে পবিত্র রাখবে, নিজকে সর্বদা আল্লাহ্‌র সামনে উপস্থিত জ্ঞান করবে সৎ ও বুযুর্গ লোকদের সংসর্গ অবলম্বন করবে, অসৎ পরিবেশ থেকে সর্বদা দূরে থাকবে, দুনিয়ার স্বল্প পরিমাণ সম্পদকে সে যথেষ্ট বরং অধিক জ্ঞান করবে ; কিন্তু আখেরাতের জন্য কৃত প্রচুর আমল ও ইবাদতকে সামান্য ও অপ্রতুল মনে করবে, অন্তরকে সর্বদা আল্লাহ্‌র ইবাদত ও আনুগত্যে মগ্ন রাখবে, জিহ্বাকে হিফাজত করবে ; নিষ্ঠার সাথে সর্বদা চিন্তামগ্ন ও ধ্যানমগ্ন থাকবে, অতীত জীবনের কৃত পাপকর্মের কথা স্মরণ করে অনুশোচনায় জর্জরিত হয়ে আল্লাহ্‌র দরবারে কান্নাকাটি করবে। তওবা ও অনুতাপের পর যদি কেউ নিজের মধ্যে এসব আলামত ও নিদর্শন লক্ষ্য করে, তা'হলে সে বুঝে নিতে পারে যে, আল্লাহ্‌র দরবারে তার তওবা কবূল হয়েছে।'

অধ্যায় ঃ ৯

মহব্বত ও অনুরাগ

কথিত আছে, এক বিজন প্রান্তরে একটি কুৎসিত-কদাকার দৃশ্যের উপর জনৈক ব্যক্তির দৃষ্টি পতিত হলে জিজ্ঞাসা করেছিল—'তুমি কে?' উত্তরে সে বলেছিল, 'আমি তোমার অন্যায়, অনাচার ও পাপাচারের দৃশ্য'। লোকটি বললো—'তোমা হতে মুক্তি পাওয়ার উপায় কি?' উত্তরে সে জানালো, 'আমার ধ্বংসাত্মকতা ও বীভৎস রূপ হতে মুক্তি পেতে হলে হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ পাঠ কর। যেমন হাদীস শরীফে আছে ঃ

اَلصَّلٰوةُ عَلَيَّ نُوْرٌ عَلَى الصِّرَاطِ وَمَنْ صَلّٰى يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثَمَانِيْنَ مَرَّةً غَفَرَ اللّٰهُ لَهٗ ذُنُوْبَ ثَمَانِيْنَ عَامًا -

'আমার উপর দরূদ পাঠ কর। কেননা, এটা তোমার জন্য পুলসিরাতের অন্ধকারে নূর ও জ্যোতির কাজ দিবে। জুমা'র দিন যে ব্যক্তি আমার প্রতি আশি বার দরূদ শরীফ পাঠ করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার আশি বৎসরের গুনাহ্ মাফ করে দিবেন।'

জনৈক ব্যক্তি হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ পড়ার ব্যাপারে খুবই গাফেল ছিল। একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সে স্বপ্নে দেখে যে, তিনি নিজ পবিত্র মুখমণ্ডলকে সেই লোকের দিক হতে ফিরিয়ে অন্য দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। সে আরয করলো— 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি কি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট?' হুযুর (সঃ) বললেন— 'না, অসন্তুষ্ট নই।' লোকটি আবার জিজ্ঞাসা করলো—'তা'হলে আপনি আমার দিকে ফিরে তাকাচ্ছেন না কেন?' আল্লাহ্র রাসূল (সঃ) বললেন ঃ এর কারণ হচ্ছে এই যে, আমি তোমাকে চিনি না। লোকটি জিজ্ঞাসা করলো ঃ হুযূর! আপনি আমাকে না চিনার কারণ কি? অথচ আমি আপনার

একজন উম্মতী, আর এ সম্পর্কে উলামায়ে-কেরাম বলেছেন—পিতা তার পুত্রকে যেমন চিনে, আপনি আপনার উম্মতের প্রত্যেককে তার চেয়েও বেশী চিনেন। হুযুর (সঃ) বললেন ঃ 'উলামায়ে-কেরাম ঠিকই বলেছেন ; কিন্তু তুমি আমাকে দরূদ পড়ার মাধ্যমে স্মরণ কর না ; উম্মতের প্রত্যেক ব্যক্তিকে আমি আমার প্রতি দরূদ প্রেরণের মাধ্যমে এবং এরই অনুপাতে চিনে থাকি, আমার প্রতি দরূদের পরিমাণ যার যত বেশী, তার সাথে আমার পরিচয় তত বেশী।' অতঃপর সেই ব্যক্তি ঘুম থেকে জাগ্রত হয়। স্বপ্নযোগে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র মুখে উক্তরূপ বিবরণ শোনার পর সে দৈনিক 'একশত বার দরূদ পড়ার দৃঢ় সংকল্প করে। এভাবে সে প্রত্যহ নিজ দায়িত্ব সম্পন্ন করে চলেছে। এরপর আরেক বার স্বপ্নের মাধ্যমে তার আল্লাহ্র রাসূলের যিয়ারত নসীব হলো, তখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সম্বোধন করে বললেন ঃ 'আমি তোমাকে চিনি এবং ক্বিয়ামতের ময়দানে আমি তোমার জন্য সুপারিশ করবো।'

প্রিয় সাধক! উপরোক্ত ঘটনায় হুযুরের কাছে পরিচিত হওয়ার এবং সুপারিশ পাওয়ার মহান নে'আমত লাভের পিছনে যে কারণটি রয়েছে, তা' হলো, সে আল্লাহ্র রাসূলের প্রতি আসক্ত হয়েছে এবং তাঁর মহব্বত ও ভালবাসা তার অন্তরে স্থান করে নিয়েছে। 'হে নবী! আপনি বলে দিন—তোমরা যদি আল্লাহ্কে ভালবেসে থাক, তা'হলে আমাকে অনুসরণ কর' পবিত্র কুরআনের এ আয়াতখানির 'শানে নুযূল' বা অবতরণের পটভূমিও ছিল তাই ; একদা সাহাবী হযরত কা'ব ইব্নে আশরাফ (রাযিঃ) তাঁর সঙ্গীদেরকে ইসলামে দীক্ষা গ্রহণের জন্য আহ্বান জানালে পর তারা বলেছিল ঃ 'আমরা তো আল্লাহ্র পুত্রতুল্য ; আমাদেরকে তিনি অত্যন্ত ভালবাসেন।' তাদের এ উক্তির জওয়াবেই কুরআনের এ আয়াতখানি নাযিল হয়। এতে আল্লাহ্তা'আলা হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হুকুম করেছেন ঃ

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ -

'বলুন (হে নবী!), তোমরা যদি আল্লাহ্কে ভালবাস, তা'হলে আমাকে অনুসরণ কর।' (আলি-ইমরান ঃ ৩১)

অর্থাৎ,—আমি তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে যে দ্বীন বা জীবন-বিধান নিয়ে এসেছি, আমার অনুসরণ করে তোমাদের বাস্তব জীবনে তা' রূপায়িত কর। এভাবে যদি তোমরা আমার অনুগত হও, তা' হলে তোমরা যে পুরস্কারে ধন্য হবে তা' হচ্ছে—

يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ط وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ○

'আল্লাহ্ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দিবেন। অবশ্যই তিনি পরম দয়ালু ও করুণাময়।' (আলি-ইমরান ঃ ৩১)

সত্যিকার মু'মিন ও খোদাভক্তদের আল্লাহ্ তা'আলাকে মহব্বত করার অর্থ হচ্ছে—তাঁরা আল্লাহ্ তা'আলার প্রতিটি আদেশ-নিষেধ পালন করেন, একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্যকে সকল গায়রুল্লাহ্‌র উপর প্রাধান্য দেন, তাঁর সন্তুষ্টি লাভের জন্য আত্মোৎসর্গ করেন। অনুরূপ, 'সত্যিকার মু'মিন ও খোদাভক্তদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা মহব্বত করেন' এর অর্থ হচ্ছে—'আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রশংসা করেন, গুণাবলী বর্ণনা করেন, তাদের উত্তম পুরস্কার দান করেন, গুণাহ্ মাফ করেন। দয়া ও অনুগ্রহ করেন, পাপকার্যে লিপ্ত হওয়া থেকে হিফাযত করেন, নেক আমল ও ইবাদতের তাওফীক দান করেন।'

চারটি বিষয় এমন রয়েছে, যেগুলো দাবী করতে হলে অপর চারটি বিষয়ে অভ্যস্থ হতে হবে। অন্যথায় এ দাবীদার মিথ্যুক বলে বিবেচিত হবে ঃ

এক. যে ব্যক্তি বেহেশ্‌তকে ভালবাসার দাবী করে এবং বেহেশ্‌তে প্রবেশের তীব্র অনুরাগ প্রদর্শন করে ; অথচ নেক আমল ও ইবাদতে মগ্ন হয় না, সে মিথ্যুক।

দুই. যে ব্যক্তি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি মহব্বতের দাবী করে ; অথচ দ্বীনের খাদেম উলামা ও বুযুর্গানে-দ্বীনকে মহব্বত করে না, সে মিথ্যুক।

তিন. যে ব্যক্তি দোযখাগ্নিকে ভয় করার দাবী করে ; অথচ পাপকার্য পরিত্যাগ করে না, সে মিথ্যুক।

চার. যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি মহব্বত ও ভালবাসার দাবী করে ; অথচ বালা-মুসীবত ও আপদ-বিপদের পরীক্ষায় অধৈর্য হয়ে শেকায়াত ও অভিযোগ ব্যক্ত করে, সে মিথ্যুক।

হযরত রাবেয়া বস্‌রিয়া (রহঃ) বলেছেন ঃ

تَعْصِى الْاِلٰـهَ وَاَنْتَ تُظْهِرُ حُبَّـهٗ
هٰذَا لَعَمْرِى فِى الْقِيَاسِ بَدِيْـعٌ

'মুখে আল্লাহ্‌কে মহব্বত করার দাবী কর ; অথচ কার্যতঃ তাঁর না-ফরমানীতে লিপ্ত রয়েছো— এটা নিঃসন্দেহে যুক্তিহীন ও অপাংক্তেয় দাবী।'

لَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لَّاَطَعْتَـهٗ
اِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُّحِبُّ مُطِيْـعٌ

'বস্তুতঃই যদি তোমার দাবী সত্য হতো, তা' হলে অবশ্যই তুমি তাঁর অনুগত হয়ে চলতে। কেননা, একথা স্বতঃসিদ্ধ যে, সত্যিকারের প্রেমিক প্রেমাস্পদের অনুগত হয়ে থাকে।'

মোটকথা, মহব্বতের চিহ্নই হচ্ছে, মাহ্‌বুব বা প্রেমাস্পদের অনুগত হওয়া, তার অনুকরণ ও অনুসরণ করা এবং সর্ববিধ অবাধ্যতা ও অমান্যতা থেকে পরহেয করা।

একদা হযরত শিবলী (রহঃ)-এর নিকট একদল লোক এসে হাজির হলে তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তোমরা কারা? উত্তরে তারা বলেছিল ঃ 'আমরা আপনার ভক্ত ; আপনাকে আমরা ভালবাসি, মহব্বত করি।' একথা শুনে হযরত শিবলী তাদেরকে লক্ষ্য করে পাথর ছুঁড়তে লাগলেন। পাথরের আঘাত সহ্য করতে না পেরে তারা দৌড়ে পালাতে লাগলো। তখন হযরত শিবলী তাদেরকে প্রশ্ন করলেন ঃ 'কিহে! পালাচ্ছ কেন? প্রকৃতই যদি তোমরা আমাকে ভালবাসতে, তা' হলে আমার পরীক্ষায় তোমরা ধৈর্যধারণ না করে পলায়ন করছো কেন?' অতঃপর হযরত শিবলী

(রহঃ) উক্তি করলেন ঃ 'আল্লাহ্‌র মহব্বত ও ভালবাসায় যারা মত্ত, তারা খোদায়ী ইশ্‌কের শরাব পান করে নিয়েছে ; ফলে, তাদের জন্য এ জগত ও মনুষ্য আবাস সংকীর্ণ হয়ে গেছে। তারা আল্লাহ্‌র যথার্থ পরিচয় লাভ করেছে ; তাই আল্লাহ্‌র মহিমা ও পরাক্রমে তারা উন্মত্ত-নিবেদিত। তারা আল্লাহ্‌র পেয়ার-আশনাইর অমৃত-সুধায় নেশাবিভোর ; তাই আল্লাহ্‌র প্রেম সাগরে তারা নিমজ্জিত হয়েছে, তার সান্নিধ্যে মুনাজাত ও প্রেম নিবেদনের আস্বাদে আত্মহারা হয়েছে।' অতঃপর হযরত শিবলী (রহঃ) এ পংক্তিটি আবৃত্তি করলেন ঃ

ذِكْرُ الْمَحَبَّةِ يَا مَوْلَايَ اَسْكَرَنِيْ

وَهَلْ رَأَيْتَ مُحِبًّا غَيْرَ سَكْرَانٍ

'হে মাওলা! ইশ্‌ক ও মহব্বতের স্মরণই আমাকে বেহুঁশ করে দিয়েছে। আর প্রকৃত প্রেমিক স্বভাবতঃই বেহুঁশ হয়ে থাকে।'

কথিত আছে, উট যখন মাতাল হয়ে যায়, চল্লিশ দিন পর্যন্ত দানা-পানি গ্রহণ করে না ; অথচ পূর্বের তুলনায় কয়েকগুণ অধিক বোঝাও সে বহন করে। এর কারণ হচ্ছে, প্রেমাস্পদের স্মরণ তখন তার অন্তরে উত্তাল তরঙ্গের ঢেউ খেলতে থাকে, প্রিয়তমের অনুরঞ্জনে মাতোয়ারা-আত্মহারা হয়ে খাদ্য গ্রহণে বিস্মৃত হয়ে যায়, অধিকতর বোঝা বহনেও অস্বস্তি অনুভব করে না। ওহে সাধক! নিজের ব্যাপারে চিন্তা কর—আল্লাহ্‌র জন্য তুমি কি কখনও হারাম ও নিষিদ্ধ বিষয়াবলী পরিহার করেছো? কখনও কি পানাহার ত্যাগ করেছো? একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি বিধানের লক্ষ্যে কোন কঠিন সাধনায় কি ব্রতী হয়েছো বা ভারী বোঝা বহন করেছো? যদি এগুলোর কোনটাই তুমি করে না থাক, তা' হলে তোমার সকল উক্তি, সকল দাবী অসার ও অর্থহীন। এহেন দাবী না দুনিয়াতে কোন কাজে আসবে, না আখেরাতে কোন উপকারে আসবে ; এতদ্বারা তুমি না দুনিয়ার মাখ্‌লুকের নিকট সম্মানের পাত্র হবে, না সৃষ্টিকর্তার নিকট পুরস্কারের যোগ্য বিবেচিত হবে।

হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু বলেছেন ঃ 'বেহেশ্‌তের প্রতি অনুরাগী ব্যক্তির লক্ষণ হচ্ছে,— নেক আমল ও ইবাদতের প্রতি দ্রুত ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে

সে ধাবিত হবে। আর যে ব্যক্তির অন্তরে দোযখের ভীতি রয়েছে সর্বদা সে নফ্‌স ও কু-প্রবৃত্তির বিরোধিতা করবে। অনুরূপ মৃত্যুর প্রতি যে দৃঢ় বিশ্বাসী, সে কখনও পার্থিব মায়া-মোহ ও আস্বাদ-আকর্ষণে মত্ত হবে না।'

হযরত ইব্‌রাহীম খাওয়াস (রহঃ)-কে মহব্বতের তাৎপর্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন ঃ 'আল্লাহ্‌র মহব্বত যার অন্তরে আছে, তার নিজস্ব এরাদা-ইচ্ছা বলতে কিছুই থাকে না। সমুদয় বৃত্তি ও মনোস্কামনা ইশ্‌কের আগুনে দগ্ধিভূত হয়ে যায়, স্বীয় সত্তাকে সে আল্লাহ্‌র মহিমা ও পরাক্রমের অতল ও অকূল সাগরে নিমজ্জিত করে দেয়।'

অধ্যায় ঃ ১০
ইশ্ক বা প্রেম-আসক্তি

'মহব্বত' বলতে কোন সুন্দর ও মনোরম বস্তুর প্রতি অন্তরে আগ্রহ ও আকর্ষণ সৃষ্টি হওয়াকে বুঝায়। এই আগ্রহ ও আকর্ষণই যখন অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে তীব্রতর রূপ ধারণ করে, তখন তার নাম হয় 'ইশ্ক'। এই ইশ্কের ক্ষেত্রে সর্বশেষ পর্যায়ে আশেক বা প্রেমিক ব্যক্তি প্রেমাস্পদের জন্য নিবেদিত প্রাণ দাসানুদাসে পরিণত হয়। স্বীয় প্রেমাস্পদের খাতিরে নিজের ধন-দৌলত, মান-সম্মান সর্বস্ব অকাতরে বিসর্জন দেয়। প্রেমিকা যুলায়খা হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালামের ইশ্কে উন্মত্ত হয়ে স্বীয় রূপ-গুণ ও ধন-সম্পদ সবকিছু বিলীন করে দিয়েছিলেন। সত্তরটি উটের বোঝা পরিমাণ তার স্বর্ণ-রৌপ্যের অলংকার ছিল ; এসবকিছুকে তিনি একমাত্র হযরত ইউসুফের জন্য উৎসর্গ করে দেন। যে কেউ তাঁর কাছে এসে যদি শুধু এতটুকু বলতো যে, আমি তোমার ইউসুফকে দেখেছি, তা' হলে বলার সাথে সাথে তাকে একটি অমূল্য স্বর্ণের মালা উপহার দিয়ে জীবনের তরে ধনবান করে দিতেন। অবশেষে তিনি নিজে সম্পূর্ণ রিক্ত হস্ত দরিদ্রে পরিণত হয়েছিলেন। তাঁর এ অবস্থাকে কেন্দ্র করে লোকমুখে প্রবাদ প্রচলিত ছিল—'ইউসুফের নামে সর্বস্ব'। ইশ্ক ও মহব্বতের আতিশয্যে তিনি সবকিছু থেকে উদাসীন ও বিস্মৃত হয়ে যেদিকে তাকাতেন, সেদিকেই কেবল ইউসুফ আর ইউসুফই দেখতে পেতেন ; এমনকি আসমানের তারকারাজিতেও তিনি ইউসুফের নাম লেখা দেখতেন।

বর্ণিত আছে—এই যুলায়খা যখন ইসলামে দীক্ষা গ্রহণ করেন তথা ঈমানী নূর লাভে ধন্য হন, অতঃপর হযরত ইউসুফের সাথে প্রণয়সূত্রে (বিবাহ বন্ধনে) আবদ্ধ তখন তিনি তাঁর থেকে পৃথক হয়ে নিরব একাকীত্বে এমনভাবে আল্লাহ্র ইবাদতে মগ্ন হয়ে যান যে, শুধুমাত্র এই ইবাদতের জন্য তিনি সর্বপ্রকার জাগতিক সম্পর্ক থেকে সম্পূর্ণরূপে নির্লিপ্ত হয়ে থাকেন। হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম যখন পেয়ার-সোহাগের জন্য দিনের বেলায়

তাঁকে আহবান করতেন, তখন তিনি রাতের ওয়াদা করে মুলতবী করতেন। আবার যখন রাতে আমন্ত্রণ জানাতেন, তখন দিবসের কথা বলে নিস্কৃতি চাইতেন। একদা হযরত ইউসুফকে উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন ঃ 'হে ইউসুফ! আল্লাহ্র পরিচয় লাভ করার পূর্বে আমি তোমাকে ভালবাসতাম ; এখন আমি আল্লাহ্র পরিচয় পেয়ে গেছি ; তাই একমাত্র তাঁর মহব্বত ও ভালবাসা ছাড়া আমার অন্তর থেকে সকল গায়রুল্লাহ্র মহব্বত দুর হয়ে গেছে এবং এজন্যে আমি কোন বিনিময়ও কামনা করি না।' হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম বললেন ঃ 'হে যুলায়খা! আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে হুকুম করেছেন এবং বলেছেন যে, তোমার গর্ভ থেকে দু'টি পুত্রসন্তান জন্ম নিবে এবং তাদেরকে নুবুওয়াত প্রদান করা হবে।' হযরত যুলায়খা বললেন ঃ 'যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে হুকুম করেছেন এবং এজন্যে আমাকে উপায় ও ওসীলা হিসাবে নির্ধারণ করেছেন, তাই এ হুকুম আমার জন্য শিরধার্য।' অতঃপর তিনি মিলনে সম্মত হন।

একদা লায়লার প্রেমিক মজনুকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল ঃ 'তোমার নাম কি?' সে বলেছিল, 'আমার নাম লায়লা?' বস্তুতঃ প্রেমাস্পদের তরে আত্মলীন হওয়ার ফলশ্রুতিতে নিজের অস্তিত্ব বিস্মৃত হওয়ার কারণেই এমনটা হয়েছে। এক ব্যক্তি মজনুকে বলেছিল ঃ কিহে মজনু! লায়লা কি মরে গেছে? সে উত্তর করেছিল ঃ 'লায়লা অবশ্যই মারা যায় নাই, সে আমার অন্তরে বিরাজমান ; আমিই লায়লা।' একদা মজনু লায়লার বাড়ীর পার্শ্ব দিয়ে যাওয়ার সময় আসমানের দিকে দৃষ্টি উঁচু করে দেখছিল। তখন এক ব্যক্তি বলেছিল—'হে মজনু! আকাশের দিকে তাকাচ্ছ কেন? লায়লার গৃহপ্রাচীরের দিকে দৃষ্টি কর, এভাবে হয়ত তাকে এক নজর দেখে নিতে পারবে।' তখন মজনু বলেছিল ঃ 'আমি আকাশের তারকারাজি দেখছি, এগুলো আমার কাছে অতি প্রিয় ; কারণ, এগুলোর ছায়া লায়লার বাড়ীর উপর পতিত হয়।'

মনসূর হাল্লাজ সম্পর্কে বর্ণিত আছে, লোকেরা তাঁকে আঠার দিন পর্যন্ত বন্দী করে রেখেছিল। এ সময় হযরত শিবলী (রহঃ) তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন ঃ 'হে মনসূর! বলুন, মহব্বতের হাকীকত কি? তিনি বলেছিলেন ঃ আজকে নয়, আগামী কল্য জিজ্ঞাসা করবেন। পরের দিন

লোকেরা তাঁকে বন্দীশালা থেকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাচ্ছিল। তখন হযরত শিবলীও সে পথ অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন। মনসূর তাঁকে দেখে চিৎকার করে বললেন ঃ 'হে শিবলী! শুনে নিন—মহব্বতের হাকীকত হচ্ছে, সূচনাতে অগ্নিদগ্ধ হওয়া আর পরিণামে প্রাণ বিসর্জন দেওয়া।'

মনসূর যখন এ বাস্তব সত্যকে প্রত্যক্ষ করলেন যে, একমাত্র আল্লাহ্‌র সত্তা চিরঞ্জীব, শাশ্বত ; আর সবকিছুই ভঙ্গুর ও ধ্বংসপ্রাপ্ত, অনুরূপ তিনি যখন দৃঢ়ভাবে হৃদয়ঙ্গম করে নিলেন এবং অন্তরে তাঁর বদ্ধমূল হয়ে গেল যে, জগতের সবকিছুতে একমাত্র আল্লাহ্‌রই সত্তা, কুদরত ও মহিমা বিরাজমান, তখন তিনি নিজের নামটুকুও বিস্মৃত হয়ে গেলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হতো, আপনি কে? তিনি বলতেন ঃ 'আনাল-হক' আমি হক্ক।

জনৈক বুযুর্গ বলেছেন ঃ'খাঁটি মহব্বতের আলামত (লক্ষণ) তিনটি ঃ এক,—নিজের বা অপর কোন মাখ্‌লুকের নয় ; স্বয়ং মাহ্‌বুব তথা প্রেমাস্পদের যবানে কথা বলা। দুই,— সমগ্র মাখ্‌লুকের সংসর্গ ত্যাগ করে কেবল মাহ্‌বুবের সান্নিধ্য অবলম্বন করা। তিন,—অপরাপর সকলের সন্তুষ্টি ও তোষামোদ পরিহার করে কেবল মাহ্‌বুবের সন্তুষ্টির জন্য ব্যগ্রচিত্ত হওয়া।'

ইশ্‌কের নিগূঢ়তত্ত্ব হচ্ছে, গোপনীয়তার পর্দা ও আবরণ উৎখাত করে দেওয়া, আচ্ছাদিত রহস্যাবলী উন্মোচিত করে দেওয়া, প্রেমাস্পদের ধ্যানমগ্নতা ও স্মৃতিচারণের অমৃত আস্বাদ ও উন্মত্ততায় আত্মহারা হওয়া, যেন শরীরের কোন অঙ্গ কর্তন করা হলেও বিন্দুমাত্র অনুভব না হয়।

এক ব্যক্তি ফুরাত নদীর তীরে গোসল করছিল। এমন সময় অপর এক ব্যক্তির কণ্ঠে নিম্নের এ আয়াতটির তিলাওয়াত শুনেছিল ঃ

وَامْتَازُوا الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُوْنَ ۝

'হে অপরাধীরা! আজ তোমরা ভিন্ন হয়ে যাও।' (ইয়াসীন ঃ ৫৯)

আয়াতটির তিলাওয়াত শুনার সাথে সাথে এর হৃদয়বিদারক প্রতিক্রিয়ার প্রভাবে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে তৎক্ষণাৎ সে নদীতে ডুবে মারা যায়।

মুহম্মদ আবদুল্লাহ বাগদাদী (রহঃ) বলেছেন ঃ 'আমি বসরা শহরে জনৈক যুবককে দেখেছি, উঁচু একটি অট্টালিকার ছাদের উপর থেকে উঁকি দিয়ে সে পথচারীকে উদ্দেশ্য করে বলছে—ইশ্‌ক ও মহব্বতের তরে প্রাণ বিসর্জন না দিয়ে কেউ কোনদিন কল্যাণ সাধন করতে পারে নাই। সুতরাং যদি কোন নিবেদিত প্রাণ ব্যক্তি প্রেমাস্পদের তরে প্রাণ বিসর্জন দিতে চায়, তা' হলে সে যেন এভাবে মৃত্যুবরণ করে। একথা বলে সে তৎক্ষণাৎ ছাদের উপর থেকে মাটিতে পড়ে গেল। পরক্ষণেই লোকজন তাকে উঠিয়ে দেখে, সে মৃত্যুবরণ করেছে।'

হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রহঃ) বলেন ঃ 'প্রকৃত তাসাওউফ হচ্ছে সর্বপ্রকার খবর ও অবস্থা থেকে বেখবর ও গাফেল থাকার নাম।'

একদা হযরত যুন্নুন মিসরী (রহঃ) মক্কা মুকার্‌রমায় মসজিদে হারামের একটি স্তম্ভের নীচে একজন যুবককে দেখলেন—নেহায়েত পীড়িত ও বিবস্ত্র অবস্থায় পড়ে আছে ; তার বেদনা ভারাক্রান্ত অন্তর থেকে আহ্ আহ্ শব্দ বের হচ্ছে। হযরত যুন্নুন বলেন ঃ 'এ অবস্থা দেখে আমি তাকে সালাম দিয়ে পরিচয় জিজ্ঞাসা করলাম।' সে বললো ঃ 'আমি একজন মুসাফির আশেক ; প্রেম-পীড়িত হয়ে পথে পড়ে আছি।' তার উত্তর শুনে আমি বিষয়টি উপলব্ধি করে বললাম ঃ 'আমিও তোমার মতই একজন।' একথা শুনে সে কাঁদতে লাগলো এবং আমিও তার সাথে কাঁদলাম। অতঃপর সে জিজ্ঞাসা করলো ঃ 'তুমিও যে কাঁদলে?' আমি বললাম ঃ 'তোমার মত আমিও একজন আশেক মুসাফির।' একথা শুনে সে আরও অধিক পরিমাণে কাঁদতে লাগলো এবং এ অবস্থাতেই হঠাৎ সজোরে এক চিৎকার দিয়ে মারা গেল। অতঃপর আমি কাপড় দিয়ে তার শরীর আচ্ছাদিত করে কাফন খরিদ করার জন্য বাজারে গমন করলাম। বাজার থেকে কাফন এনে দেখি, সে নাই। তখন আমি আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললাম ঃ সুবহানাল্লাহ (কোথায় গেল)! এমন সময় একটি গায়েবী আওয়ায আমার কানে ভেসে আসলো—'হে যুন্নুন! সে এমন এক পথিক, যাকে শয়তান আক্রমণ করতে চেয়েছে ; কিন্তু পারে নাই, তোমার সম্পদের কিয়দাংশ তাকে স্পর্শ করতে চেয়েছে ; তা' ও হয় নাই, রিদওয়ান ফেরেশতা তাকে জান্নাতে আহ্বান জানিয়েছে ; তা' ও সে প্রত্যাখ্যান করেছে।' আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ 'এখন সে কোথায় আছে?' উত্তর আসলো—

فِيْ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيْكٍ مُّقْتَدِرٍ

'যোগ্য আসনে, সর্বাধিপতি সম্রাটের সান্নিধ্যে।' (ক্বামার ঃ ৫৪)

লোকটিকে উক্ত পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে। এর কারণ হচ্ছে সে আল্লাহ্‌র আশেক ছিল, অত্যধিক ইবাদতে নিমগ্ন থাকতো এবং তওবা ও অনুতাপে দ্রুত অগ্রগামী হতো।

জনৈক বুযুর্গকে ইশ্‌ক ও মহব্বতের তাৎপর্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছিলেন ঃ 'মাখ্‌লূকের সাথে সম্পর্ক কম রাখবে, অধিকতর নির্জনতা ও একাকীত্ব অবলম্বন করবে, সর্বদা চিন্তাশীল থাকবে, নিশ্চুপ থাকবে, চক্ষু উত্তোলন করবে কিন্তু দৃষ্টিপাত করবে না, সম্বোধন করা হলে শুনবে না, কিছু বলা হলে অনুধাবন করবে না, মুসীবতে ধৈর্যহারা হবে না, ক্ষুধার্ত হলে অনুভব করবে না, বিবস্ত্র হলে খবর থাকবে না, গালি বা ভৎর্সনা দিলে বুঝবে না, মানবকে ভয় করবে না, নির্জনে আল্লাহ্‌ তা'আলার ধ্যানে মগ্ন থাকবে, সর্বদা তাঁর প্রতি আকৃষ্ট থাকবে, একাকীত্বে মুনাজাত করবে, পার্থিব ঝঞ্ঝাটে দুনিয়াদার লোকদের সাথে জড়িত হবে না।'

হযরত আবু তুরাব বখ্‌শী (রহঃ) মহব্বত সম্পর্কে নিম্নের কয়েকটি পংক্তি আবৃত্তি করেছেন, যেগুলোর সারমর্ম হচ্ছে ঃ 'পার্থিব কোন ব্যাপারে ধোকায় পড়ো না ; প্রতারিত হয়ো না। কেননা, এসবই প্রেমিকের জন্য প্রেমাস্পদের উপঢৌকন। দুঃখ-কষ্ট ও বালা-মুসীবত যা প্রেমাস্পদের পক্ষ থেকে এসে থাকে, সবই সে আনন্দচিত্তে বরণ করে নেয়। অভাব-অনটন ও দারিদ্রকেও প্রেমাস্পদের পক্ষ থেকে নগদ দান, সম্মান ও সন্তুষ্টির প্রতীক জ্ঞান করে নেয়। প্রকৃত প্রেমিকের আরেকটি লক্ষণ হচ্ছে, শত্রুর শত ধিক্কার ও প্রতারণা সত্ত্বেও তার পদস্খলন হয় না ; বরং উত্তরোত্তর প্রেমাস্পদের প্রতি তার প্রত্যয় ও আসক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে।'

একদা হযরত ঈসা আলাইহিস্‌ সালাম একজন যুবকের পার্শ্ব দিয়ে পথ অতিক্রম করছিলেন। যুবকটি বাগানে পানি-সিঞ্চন কার্যে রত ছিল। হযরত ঈসা আলাইহিস্‌ সালামকে দেখে সে আরয করলো ঃ 'হে আল্লাহ্‌র নবী! আপনি দো'আ করুন, যেন আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাকে তাঁর মহব্বতের অণু পরিমাণ অংশ দান করেন।' হযরত ঈসা আলাইহিস্‌ সালাম বললেন ঃ

'তোমার মধ্যে তা' সহ্য করার ক্ষমতা নাই।' যুবক বললো ঃ 'তা' হলে অর্ধাণু পরিমাণ মহব্বতের জন্য দো'আ করুন।' অতঃপর হযরত ঈসা আলাইহিস্‌ সালাম দো'আ করলেন ঃ 'হে মহান প্রভু! এই যুবককে আপনার মহব্বতের অর্ধাণু পরিমাণ দান করুন।' দো'আর পর হযরত ঈসা (আঃ) আপন পথে চলে গেলেন। দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার পর তিনি সেই যুবকের বাড়ীর পার্শ্ব দিয়ে যাওয়ার সময় তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। লোকেরা বললো, বহুদিন যাবত যুবকটি পাগল অবস্থায় কালাতিপাত করছে এবং বর্তমানে সে পর্বতের চূড়ায় চূড়ায় ঘুরে বেড়ায়। এ খবর শুনে হযরত ঈসা আলাইহিস্‌ সালাম দো'আ করলেন ঃ 'হে আল্লাহ্‌ সেই নওজওয়ানের সাথে আমাকে সাক্ষাৎ করিয়ে দিন।' দো'আর পর হযরত ঈসা (আঃ) দেখতে পেলেন—সেই যুবক অসংখ্য পর্বতমালার মাঝখানে একটি উঁচু শিখরে আসমানের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। হযরত ঈসা (আঃ) তাকে সালাম দিলেন ; কিন্তু সে কোন উত্তর দিল না। পুনরায় হযরত ঈসা নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন ঃ 'আমি ঈসা'। এ সময় আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে হযরত ঈসা আলাইহিস্‌ সালামের প্রতি ওহী আসলো ঃ 'হে ঈসা! যার অন্তরে আমার মহব্বতের অর্ধাণু পরিমাণও প্রবেশ করেছে, সে কখনও মানুষের আওয়ায শুনতে পারে না। শুনে রাখ,— আমার মহত্ত্ব ও পরাক্রমশীলতার কসম, তুমি যদি করাত দিয়ে তাকে চৌচির করে দাও, তবুও সে বিন্দুমাত্রও অনুভব করবে না।'

যে ব্যক্তি নিজের জীবনে তিনটি বিষয়ের দাবী করেছে ; অথচ আত্মাকে অপর তিনটি বিষয়ের কলুষতা হতে মুক্ত করতে পারে নাই, সে নির্ঘাত ধোকায় পড়ে রয়েছে ঃ এক,—হৃদয়ে আল্লাহ্‌র যিকরের সুমিষ্ট আস্বাদের দাবী করে ; অথচ দুনিয়ার মহব্বত পরিত্যাগ করে নাই। দুই,—ইবাদতে ইখ্‌লাস ও নিষ্ঠার দাবী করে ; অথচ মানুষের কাছে সম্মান ও সুযশের লিপ্সা পরিহার করে নাই। তিন,—আল্লাহ্‌র মহব্বতের দাবী করে ; অথচ নিজেকে তুচ্ছ ও নিকৃষ্টতম জ্ঞান করে না।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

سَيَأْتِيْ زَمَانٌ عَلٰى اُمَّتِيْ يُحِبُّوْنَ خَمْسًا وَيَنْسَوْنَ خَمْسًا

يُحِبُّونَ الدُّنيَا وَ يَنسَونَ الاٰخِرَةَ وَ يُحِبُّونَ المَالَ وَيَنسَونَ الحِسَابَ وَيُحِبُّونَ الخَلقَ وَيَنسَونَ الخَالِقَ وَيُحِبُّونَ الذُّنُوبَ وَيَنسَونَ التَّوبَةَ وَيُحِبُّونَ القُصُورَ وَيَنسَونَ المَقبَرَةَ -

'অদূর ভবিষ্যতে আমার উম্মতের উপর এমন এক সময় আসবে, যখন তারা পাঁচটি বিষয়কে ভালবাসবে ; কিন্তু সেই সঙ্গে অপর পাঁচটি বিষয়কে ভুলে যাবে,—তারা দুনিয়াকে ভালবাসবে ; কিন্তু আখেরাতকে ভুলে যাবে। তারা ধন-দৌলতকে ভালবাসবে ; কিন্তু এর হিসাব-নিকাশের কথা ভুলে যাবে। তারা পাপকার্যকে ভালবাসবে ; কিন্তু তওবা করতে ভুলে যাবে। তারা বড় বড় অট্টালিকাকে ভালবাসবে ; কিন্তু কবরের কথা ভুলে যাবে।'

মনসূর ইবনে আম্মার (রহঃ) এক যুবককে নসীহত করতে গিয়ে বলেছিলেন ঃ 'হে যুবক! তুমি সদা-সর্বদা সতর্ক থাক ; যৌবন যেন তোমাকে প্রতারিত না করে ; বহু নওজওয়ানকে দেখা গেছে —জীবনের কৃত পাপরাশি হতে তওবা করতে বিলম্ব করেছে, অন্তরে দীর্ঘ আশা পোষণ করেছে, মৃত্যুকে স্মরণ করে নাই আর শুধু বলেছে, আগামী কল্য অথবা পরশু তওবা করবো ; এভাবে দীর্ঘ সময় অতীত হওয়ার পর অবশেষে তওবার সুযোগ আর হয় নাই, বঞ্চিত ও প্রতারিত হয়েই সে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে এবং একেবারে রিক্ত হস্তে কবরে গিয়েছে। পার্থিব প্রচুর ধন-সম্পদ, দাস-দাসী, পিতা-মাতা, আওলাদ-পরিজন কিছুই তার উপকারে আসে নাই। যেমন পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন ঃ

لَا يَنفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُونَ ۝ إِلَّا مَن أَتَى اللّٰهَ بِقَلبٍ سَلِيمٍ ۝

'(কিয়ামতের দিন) কোন অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কারও কোন উপকারে আসবে না। একমাত্র সেই ব্যক্তি মুক্তি পাবে, যে সুস্থ অন্তঃকরণ নিয়ে আল্লাহ্র কাছে পৌঁছবে।' (শু'আরা ঃ ৮৮,৮৯)

ওগো খোদা! আমাদেরকে মৃত্যুর পূর্বে তওবার তাওফীক দান করুন

গাফলতি ও উদাসীনতা হতে মুক্তি দান করুন, কিয়ামতের ময়দানে আপনার হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাফা'আত নসীব করুন। বস্তুতঃ প্রকৃত ঈমানের পরিচয় হচ্ছে, সুযোগের প্রথম মুহূর্তেই তওবা করা, কৃত পাপকার্যের উপর অনুতপ্ত হওয়া, লজ্জা ও অনুশোচনায় ভেঙ্গে পড়া, নশ্বর পৃথিবীর ন্যূনতম রিযিক ও দ্রব্যের উপর তুষ্ট থাকা, যাবতীয় দুনিয়াবী ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত থাকা এবং ই্খলাস ও নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ্র ইবাদতে নিমগ্ন থাকা।

একদা জনৈক কৃপণ ও মুনাফিক ব্যক্তি নিজের স্ত্রীকে কসম দিয়ে বলেছিলো ঃ 'তুমি যদি কোন মিস্কীনকে দান-খয়রাত কর, তা' হলে আমি তোমাকে তালাক দিয়ে দিবো।' পরবর্তী কোন এক সময়ে একজন মিস্কীন এসে গৃহের দরজায় হাঁক ছেড়ে বললো ঃ 'হে গৃহবাসী! আমাকে আল্লাহ্র ওয়াস্তে কিছু দান কর।' ঘর থেকে স্ত্রী তাকে তিনটি রুটি দান করলো। রুটি নিয়ে যাওয়ার সময় পথিমধ্যে অকস্মাৎ সেই মিস্কীন মুনাফিকের সম্মুখীন হয়ে গেলে জিজ্ঞাসা করলো ঃ 'তুমি এ রুটি কোত্থেকে পেলে?' মিস্কীন লোকটি মুনাফিকের গৃহের কথা বললো। অতঃপর সে বাড়ীতে গিয়ে স্ত্রীকে শাসনের স্বরে জিজ্ঞাসা করলো ঃ 'আমি কি তোমাকে কসম দিয়ে বলি নাই? দান-খয়রাত করলে তালাক দিয়ে দিবো? স্ত্রী বললো ঃ 'আমি আল্লাহ্র নামে দান-খয়রাত করেছি।' এ কথা শুনে মুনাফিক চটে গিয়ে একটি অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত করে উত্তপ্ত অগ্নিতে তাকে আল্লাহ্র নামে ঝাঁপ দিতে আদেশ করলো। নির্দেশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী গহনা-অলঙ্কারে সজ্জিতা হয়ে প্রস্তুত হয়ে গেল। এ সময় মুনাফিক স্বামী তাকে গহনা-অলঙ্কার খুলে ফেলার নির্দেশ দিলে স্ত্রী উত্তরে বললো ঃ 'বন্ধু বন্ধুর জন্য সাজ-সজ্জা গ্রহণ করে থাকে ; এখন আমি আমার প্রিয় বন্ধুর সাক্ষাত লাভে ধন্য হতে যাচ্ছি'—একথা বলেই সে অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়লো। অতঃপর মুনাফিক আগুনের গর্তটি উপর দিয়ে ঢেকে রেখে চলে গেলো। তিন দিন পর ফিরে এসে গর্তটি খুলে দেখলো—তার স্ত্রী দিব্যি যেমন ছিলো তেমনি সহী-সালামতে জীবিত রয়েছে। এ দৃশ্য দেখে সে বিস্ময়াভিভূত হয়ে গেলো ; এমন সময় অদৃশ্য একটি আওয়ায ভেসে আসলো—'তুমি কি একথা বিশ্বাস কর না যে, অগ্নি আমার প্রিয়জনকে কখনো স্পর্শ

করে না।'

ফেরআউনের স্ত্রী হযরত আছিয়া (রাযিঃ) নিজের ঈমানদার হওয়ার বিষয়টি বহুকাল পর্যন্ত ফেরআউন থেকে গোপন করে রেখেছিলেন। অবশেষে বিষয়টি ফেরআউনের গোচরীভূত হওয়ার পর হযরত আছিয়াকে সে বিভিন্নরূপে শাস্তি প্রদানের হুকুম দিল। সেমতে তাঁকে বহু রকমে উৎপীড়ন করা হয়। ফেরআউন তাঁকে বলেছিল ঃ 'হে আছিয়া! তুমি তোমার দ্বীনকে পরিত্যাগ কর।' কিন্তু হযরত আছিয়া দ্বীন ও ঈমানের উপর অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে স্থিত ছিলেন। পরিশেষে তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে কীলক (পেরেক) পুতে দেওয়া হয়েছিল। এ অবস্থায়ও ফেরআউন যখন তাঁকে দ্বীন ও ঈমান পরিত্যাগ করার নির্দেশ দিচ্ছিল, তখন তিনি উত্তর করছিলেন ঃ 'হে ফেরআউন! তুমি আমার শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পার ; কিন্তু অন্তঃকরণ তো আল্লাহ্‌র হাতে ; সেখানে তুমি কোনরূপ অধিকার বা ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবে না ; জেনে রাখ, তুমি যদি আমার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে টুক্‌রা টুক্‌রা করে ফেলো, তাতে আমার ঈমানে কোন প্রকার দুর্বলতা সৃষ্টি হওয়া তো দূরের কথা ; বরং এতে আমার ঈমান আরও বৃদ্ধি পাবে।' এ সময় হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম হযরত আছিয়ার পার্শ্ব দিয়ে পথ অতিক্রম করছিলেন, তখন হযরত আছিয়া তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ 'হে মূসা! আপনি বলুন—খোদা আমার প্রতি সন্তুষ্ট আছেন কিনা?' হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম বললেন ঃ 'হে আছিয়া! আসমানের ফেরেশ্‌তাকুল তোমার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষমান এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের সম্মুখে তোমার বিষয়ে গৌরব করছেন, তোমার যা মনোবাসনা আছে, আল্লাহ্‌র কাছে তুমি এখন তা' চেয়ে নাও, তিনি তোমার দো'আ কবুল করবেন।' তখন হযরত আছিয়া দো'আ করলেন ; কুরআনের ভাষায় ঃ

رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ
وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝

'হে আমার পালনকর্তা! আপনার সন্নিকটে জান্নাতে আমার জন্যে একটি

গৃহ নির্মাণ করুন, আমাকে ফেরআউন ও তার দুষ্কর্ম হতে উদ্ধার করুন এবং আমাকে জালেম সম্প্রদায় হতে মুক্তি দিন।' (তাহ্‌রীম ঃ ১১)

হযরত সালমান (রাযিঃ) হতে বর্ণিত—ফেরআউন তার স্ত্রী আছিয়াকে প্রখর রৌদ্রে শাস্তি দিতো। তখন ফেরেশ্‌তারা আপন আপন ডানার সাহায্যে তাঁকে ছায়া দান করতো। হযরত আছিয়া তখন বেহেশ্‌তে স্বীয় আবাসস্থল দেখতে পেতেন।

হযরত আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত—ফেরআউন তার স্ত্রী আছিয়ার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে চারটি কীলক (পেরেক) পুতে দিয়েছিল এবং বুকের উপর ভারী চাকী বা পেষণ-যন্ত্র স্থাপন করে রেখেছিল। এহেন উৎপীড়নের সময় তাঁর চেহারাকে প্রখর উত্তাপময় সূর্যের দিকে ফিরিয়ে দিতো। এ সময় হযরত আছিয়া আকাশ পানে মাথা উঠিয়ে দো'আ করতেন ঃ 'ওগো খোদা! তোমার অতি নিকটে বেহেশ্‌ত মাঝে আমাকে আবাস দান কর।'

হযরত হাসান (রাযিঃ) বলেন ঃ 'আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আছিয়াকে অতি উত্তমরূপে মুক্তি দান করেছেন এবং বেহেশ্‌তে তাঁকে অতি উচ্চ মর্যাদা দিয়েছেন। তিনি বেহেশ্‌তে যেকোন স্থানে বিচরণ করেন এবং পানাহার করে থাকেন।' অতএব সাধকের কর্তব্য হচ্ছে,—সর্বদা আল্লাহ্‌র পানাহ্ চাওয়া ; একমাত্র তাঁরই নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা। কেননা আপদ-বিপদ ও উৎপীড়ন থেকে মুক্তির জন্য দো'আ করা পূত-চরিত্র নেক বান্দাদের তরীকা ও আদর্শ এবং এটাই প্রকৃত ঈমানের লক্ষণ।

অধ্যায় ঃ ১১

আল্লাহ ও রাসূলের (সঃ) আনুগত্য ও মহব্বত

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ

'বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তা'হলে আমাকে অনুসরণ কর, আল্লাহ্ও তোমাদেরকে ভালবাসবেন।' (আলি ইমরান ঃ ৩১)

হে মানব! এ কথা স্মরণ রাখ যে, আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি তোমার মহব্বতের অর্থ হচ্ছে, ইবাদত ও ইতা'আত তথা আল্লাহ্র দাসত্ব ও বন্দেগী করা এবং হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য ও অনুসরণ করা। আর 'আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে ভালবাসবেন' এর অর্থ হচ্ছে, তোমার গুণাহ্ মাফ করবেন এবং তোমার প্রতি রহমত ও অনুগ্রহ করবেন। বস্তুতঃ বান্দার অন্তঃকরণে যদি এ বিশ্বাস বদ্ধমূল হয় যে, সর্বগুণ–উৎকর্ষ ও রূপ–সৌন্দর্যের আধার ও মালিক একমাত্র আল্লাহ্, বান্দার মধ্যে যে গুণ ও সৌন্দর্য পরিলক্ষিত হয় তা' একমাত্র আল্লাহ্রই দেওয়া এবং তাঁরই সৌন্দর্যের বিকাশ মাত্র আর এ বিকাশও অস্তিত্বমান হয় একমাত্র তাঁরই অনুগ্রহের ফলে, তা'হলে বান্দার মহব্বত একমাত্র আল্লাহ্র জন্যই নির্ধারিত হয়ে যাবে। আর সে আল্লাহ্র জন্য নিবেদিত–প্রাণ অনুগতে পরিণত হবে। ফলে, উক্ত মহব্বতের আবেদনেই সে আল্লাহ্র ইবাদত ও হুকুম–আহকাম পালন করবে এবং তাঁর নৈকট্য অর্জনের চেষ্টায় নিরত থাকবে। তাই, অনেকে মহব্বতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ 'ইবাদতের জন্য দৃঢ়সংকল্প করা এবং কার্যতঃ এর বাস্তবায়ন করার নামই মহব্বত'। আর এই ইবাদত ও হুকুম পালনে রীতি–পদ্ধতির প্রশ্নে অনিবার্যরূপে দেখা দেয় 'এত্তেবায়ে রাসূল' বা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য ও অনুসরণের বিষয়টি।

হযরত হাসান (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত—'একদা হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র যুগে কয়েকজন লোক এসে বললো ঃ 'হুযুর! আমরা আমাদের রব্ব (আল্লাহ্)–কে মহব্বত করি।' তাদের এ কথাটিকে উপলক্ষ করেই নাযিল হয়েছে উপরোক্ত আয়াতটি।'

হযরত বিশ্র হাফী (রহঃ) বলেন ঃ 'একদা স্বপ্নযোগে আমার হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যিয়ারত নসীব হয়। তখন তিনি আমাকে বললেন ঃ 'হে বিশ্র! তুমি কি জান— আল্লাহ্ তা'আলা সমকালীন লোকদের মধ্যে তোমাকে কেন এত উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন?' উত্তরে আমি নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ করলে তিনি বললেন ঃ 'শুন, এর কারণ হচ্ছে—তুমি আল্লাহ্র নেক বান্দাদের খেদমত করে থাক, ভ্রাতৃবৃন্দের হিত কামনা করে থাক, বন্ধুজন ও আমার সুন্নতের অনুসারীদেরকে মহব্বত করে থাক এবং তুমি নিজেও আমার সুন্নতের অনুসরণ কর।'

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

مَنْ اَحْيَا سُنَّتِيْ فَقَدْ اَحَبَّنِيْ وَمَنْ اَحَبَّنِيْ كَانَ مَعِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الْجَنَّةِ ـ

'যে ব্যক্তি আমার সুন্নতের উপর আমল করে সেটিকে জিন্দা রাখলো, সে মূলতঃ আমাকে ভালবাসলো! আর আমাকে যে ভালবাসে, সে পরকালে জান্নাতে আমার সঙ্গে বাস করবে।'

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে ঃ 'ফিতনা, বিপর্যয় এবং বিভিন্ন ভ্রান্ত দল–উপদলের উদ্ভবের যমানায় যারা আমার সুন্নতকে আঁকড়িয়ে ধরে থাকবে, তারা (প্রত্যেকেই) একশত শহীদের মর্যাদা লাভ করবে।' হাদীস শরীফে আরও বর্ণিত হয়েছে ঃ 'কেবল অস্বীকারকারী দল ব্যতীত আমার উম্মতের সকলেই জান্নাতে যাবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, 'অস্বীকারকারী লোক কারা?' হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন ঃ 'যারা আমার অনুসরণ করবে, তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর যারা আমার অনুসরণ করবে না তারাই প্রকৃত অস্বীকারকারী ; আমার সুন্নত ও তরীকাবর্জিত যে কোন আমল মূলতঃ আমার প্রতি অবাধ্যতা ও না–ফরমানীর প্রকাশ

মাত্র।'

জনৈক বুযুর্গ বলেছেন ঃ 'তুমি যদি কোন পীরকে আকাশে উড়তে দেখ অথবা সমুদ্রে পানির উপর হেঁটে যেতে দেখ অথবা আগুন ভক্ষণ করতে দেখ কিংবা এ ধরণের কোন অত্যাশ্চর্য কাজ করতে দেখ ; কিন্তু অপরদিকে যদি তাকে আল্লাহ্‌র কোন ফরয হুকুম অথবা নবীজীর (সঃ) কোন সুন্নত পরিত্যাগ করতে দেখ, তা' হলে একথা নিশ্চিতভাবে জেনে রাখ যে, এ ব্যক্তি মিথ্যুক ও ধোকাবাজ, তার উক্তরূপ কর্মকাণ্ড কারামত নয় ; বরং সম্পূর্ণ কুহক-ভেলকি মাত্র।' আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে ধোকা ও প্রবঞ্চনা হতে হিফাযত করুন।

হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রহঃ) বলেন ঃ 'জগতের যে কোন কাজ যদি সুন্নতের অনুসরণ ব্যতীত অনুষ্ঠিত হয় তা' হলে জেনে রাখ, সেটা সম্পূর্ণ গলদ ও ভ্রান্ত।' যেমন হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

مَنْ ضَيَّعَ سُنَّتِيْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ شَفَاعَتِيْ -

'যে ব্যক্তি আমার সুন্নতকে পরিত্যাগ করেছে, তার জন্য আমার শাফা'আত হারাম করে দেওয়া হয়েছে।'

হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রহঃ) বলেন ঃ 'আমাদের উস্তায হযরত সিররী সাকতী (রহঃ) একদা পীড়িত হওয়ার পর বহু অন্বেষণের পরও কোথাও তাঁর রোগ নিরাময়ের ঔষধ পাওয়া যায় নাই এবং তাঁর ব্যাধির মূল উৎস কি, তা' নিরূপণ করাও সম্ভব হয় নাই। একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসককে বোতলে করে তাঁর প্রস্রাব দেখানো হলে তিনি মন্তব্য করেছিলেন ঃ 'আমি স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করছি যে, এটা কোন আশেক বা প্রেমোন্মাদ ব্যক্তির প্রস্রাব।' একথা শুনার পর হযরত জুনাইদ (রহঃ) মূর্ছে পড়লেন ; তৎক্ষণাৎ চিৎকার দিয়ে তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন এবং তার হস্তস্থিত প্রস্রাবের বোতলটি পড়ে গেল। হযরত জুনাইদ বলেন ঃ আমি ফিরে এসে হযরত সিররী সাকতী (রহঃ)-কে সমস্ত ঘটনা খুলে বলার পর তিনি শুনে মৃদু হেসে বললেন ঃ 'ডাক্তার বড় অভিজ্ঞ।' আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ হুযুর! প্রস্রাব দেখেও কি ইশ্‌ক ও মহব্বতের বিষয় অনুভব করা যায়? তিনি

বললেন ঃ 'অবশ্যই'।

হযরত ফুযাইল (রহঃ) বলেন ঃ 'তোমাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে, আল্লাহ্‌কে তুমি মহব্বত কর কিনা? এ প্রশ্নের উত্তরে তুমি নিশ্চুপ থাকবে। কেননা তুমি যদি উত্তরে 'না' বলো, তা'হলে এটা হবে কুফ্‌র। আর যদি উত্তরে 'হাঁ' বলো, তা' হলে এটা মহব্বতকারীদের নীতি ও চরিত্র-বহির্ভূত কাজ হবে ; এভাবে হয়ত তোমাকে প্রেমাস্পদের রোষের ভাগী হতে হবে।'

হযরত সুফিয়ান সাওরী (রহঃ) বলেন ঃ 'আল্লাহ্‌র প্রতি মহব্বতকারীকে যদি কেউ ভালবাসে, তা' হলে প্রকৃতপক্ষে সে আল্লাহ্‌কেই ভালবাসলো। অনুরূপ, আল্লাহ্‌র প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধাকারী ব্যক্তিকে যদি কেউ সম্মান করে, তা'হলে প্রকৃতপক্ষে সে আল্লাহ্‌কেই সম্মান করলো।'

হযরত সাহ্‌ল (রহঃ) বলেন ঃ 'আল্লাহ্‌কে মহব্বত করার লক্ষণ হচ্ছে কুরআনের প্রতি মহব্বত থাকা, আল্লাহ্ এবং কুরআনকে মহব্বত করার লক্ষণ হচ্ছে হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি মহব্বত থাকা, হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মহব্বত করার লক্ষণ হচ্ছে তাঁর সুন্নতের প্রতি মহব্বত থাকা, তাঁর সুন্নতের প্রতি মহব্বত থাকার লক্ষণ হচ্ছে আখেরাতের প্রতি মহব্বত থাকা, আখেরাতকে মহব্বত করার লক্ষণ হচ্ছে দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি ও ঘৃণা থাকা এবং দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তির লক্ষণ হচ্ছে দুনিয়ার দ্রব্য-সামগ্রী নিতান্ত প্রয়োজনে যৎসামান্য মাত্র গ্রহণ করা ; যতটুকু পরকালের পথিকের জন্য না-হলেই না-হয়।'

হযরত আবুল হাসান যান্‌জানী (রহঃ) বলেন ঃ 'ইবাদতের মৌল বিষয়কে ত্রিবিধ অঙ্গের সাথে সংযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। যথা ঃ চোখ,—এর মাধ্যমে তুমি দৃষ্টি করে ইব্‌রত ও শিক্ষা হাসিল করবে। দ্বিতীয় ঃ অন্তর,—এর মাধ্যমে চিন্তা-ফিকির ও ধ্যান-প্রণিধান করবে। তৃতীয় ঃ রসনা (জিহবা),—এর মাধ্যমে তুমি সত্য ও হক কথা বলবে এবং আল্লাহ্‌র যিকির ও তাসবীহ্-তাহ্‌লীল করবে। যেমন আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

اُذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا ۙ وَّسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ۝

'মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্কে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর এবং সকাল বিকাল আল্লাহ্র তসবীহ পাঠ কর।' (আহ্যাব ঃ ৪১,৪২)

একদা হযরত আবদুল্লাহ ও হযরত আহমদ ইব্নে হরব্ (রহঃ) কোথাও গিয়েছিলেন। তথায় হযরত আহমদ ইবনে হরব্ (রহঃ) মাটির উপর থেকে কিছু তরু-তাজা ঘাস উপ্ড়িয়ে ফেলেছিলেন। তখন হযরত আবদুল্লাহ (রহঃ) তাঁকে বললেন ঃ দেখ, হে আহমদ! তোমার এ কাজটির কারণে পঞ্চবিধ ক্ষতি সাধিত হয়েছে ঃ এক, তোমার অন্তর মাওলা পাকের যিক্র ও তসবীহ থেকে বিচ্যুত হয়ে এই ঘাসে মগ্ন হয়েছে। দুই, তোমার নফ্সকে আল্লাহ্র যিক্রের পরিপন্থী কাজে অভ্যস্থ হওয়ার সুযোগ করে দিলে। তিন, তুমি এ অহেতুক কাজটির পথ খুলে দিলে, অন্যরা এখন তোমার অনুকরণে এতে লিপ্ত হবে। চার, তুমি এ ঘাসের যিক্রে ব্যাঘাত সৃষ্টি করলে। পাঁচ, কিয়ামতের দিন তোমার বিরুদ্ধে নালিশের পক্ষে তুমি নিজেই একটি প্রমাণ প্রস্তুত করে দিলে।'

হযরত সির্রী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, আমি হযরত জুরজানী (রহঃ)-কে দেখেছি, তিনি শুধু ছাতু খেয়ে ক্ষুধা নিবারণ করতেন। একদা আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ 'আপনি কেবল ছাতু আহার করে থাকেন, অন্য কোন খাদ্য-দ্রব্য গ্রহণ করেন না—এর কারণ কি?' তিনি বললেন ঃ 'হে সির্রী! অপর কোন খাদ্যবস্তু চিবিয়ে খাওয়ার জন্য অধিক সময় ব্যয় করতে হয় ; আমি হিসাব করে দেখেছি এ সময়টুকুতে শুধু ছাতু খেয়ে নিলে আমি নব্বই বার বেশী 'সুবহানাল্লাহ্' পড়তে পারি। এই তারতম্যের কারণেই আজকে চল্লিশ বৎসর যাবত আমি রুটি আহার করি না।'

হযরত সাহ্ল ইবনে আবদুল্লাহ (রহঃ) প্রতি পনের দিন পর একবার মাত্র আহার করতেন। রমযান মাসে সেহ্রী ও ইফ্তারের সময় মাত্র এক এক লুকমা খাদ্য গ্রহণ করতেন। কোন কোন সময় এমন হতো যে, তিনি সত্তর দিন পর্যন্ত না খেয়ে থাকতেন ; খানা খেলে তাঁর শরীর দুর্বল হয়ে যেতো আর না খেলে তিনি সবল থাকতেন।

আবু হাম্মাদ আস্ওয়াদ (রহঃ) ত্রিশ বৎসরকাল মসজিদুল-হারামে অবস্থান করে কাটিয়েছেন। এ দীর্ঘ সময়ে কেউ তাঁকে পানাহার করতে দেখে নাই এবং তাঁর একটি মুহূর্তও আল্লাহ্র যিক্র ছাড়া অতিবাহিত হয় নাই।

হযরত আমর ইবনে উবাইদ (রহঃ) মাত্র তিনটি কাজের জন্য ঘর থেকে বের হতেন ঃ এক, জামাতের সাথে নামায পড়ার জন্য। দুই, কোন রোগীর সেবা-শুশ্রূষার জন্য। তিন, জানাযায় শরীক হওয়ার জন্য। তিনি বলতেন ঃ 'আমি মানুষের মূল্যবান জীবন চুরি-ডাকাতি করে বিনষ্ট করতে দেখেছি ; অথচ জীবন হচ্ছে মানুষের মহামূল্য রত্ন এর সাহায্যে আখেরাতের অনন্তকালের জীবনের জন্য সম্পদ সঞ্চয় করা উচিত। হে আখেরাতের পথে বিচরণকারী! তোমার জন্য অপরিহার্য যে, তুমি পার্থিব দ্রব্য-সামগ্রীর লোভ-লালসা থেকে সম্পূর্ণরূপে পাক-পবিত্র হয়ে যাও। যাতে একমাত্র আখেরাতের ফিকির ছাড়া অন্য কোন ধান্দা তোমাকে স্পর্শ করতে না পারে, তোমার ভিতর ও বাহির যাতে একই ফিকিরে নিমগ্ন থাকে। তা' হলেই তোমার দ্বারা আখেরাতের জীবনে কল্যাণ সাধন সম্ভব ও সহজতর হবে।

হযরত শিবলী (রহঃ) বলেন ঃ 'প্রথম প্রথম আমি নিদ্রার আধিক্য থেকে বাঁচার জন্য সুরমার সাথে নিমক (লবণ) মিশ্রণ করে চোখে ব্যবহার করতাম। পরবর্তীতে যখন পূর্ণ রাত্রি জাগরণে ব্রতী হয়েছি, তখন থেকে চোখে শুধু নিমক ব্যবহার করে থাকি।'

হযরত ইব্রাহীম ইবনে হাকেম (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, আমার পিতা নিদ্রার অধিক মাত্রাকে পরাভূত করার জন্য নদীতে অবতরণ করে সাঁতার কাটতে আরম্ভ করতেন। তখন দরিয়ার মৎস্যরাজি তাঁকে ঘিরে আল্লাহ্র যিক্র ও তাসবীহ করতে থাকতো। হযরত ওহ্ব ইবনে মুনাব্বিহ্ (রহঃ) আল্লাহ্র নিকট দো'আ করেছেন, যাতে সম্পূর্ণরূপে তাঁর নিদ্রাকে উঠিয়ে নেন। ফলে, চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত তিনি এক মুহূর্তও ঘুমান নাই। হযরত হাসান হাল্লাজ (রহঃ) নিজেকে টাখ্নু হতে হাঁটু পর্যন্ত তেরটি বেড়ীর বন্ধনে আবদ্ধ করে রেখেছিলেন। এতদ্সত্ত্বেও তিনি প্রতি রাতে এক হাজার রাকাত নফল নামায পড়তেন। হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রহঃ) তাসাওউফে ব্রতী হওয়ার পর সূচনাতেই এতটুকু অগ্রসর হয়েছিলেন যে, দোকান খুলে তাতে প্রবেশ করার পর পর্দা টানিয়ে দিতেন এবং চারশত রাকাত নফল নামায পড়ে বাড়ী ফিরে যেতেন।

হযরত ইব্নে দাউদ (রহঃ) চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত ইশা'র উযূ দিয়ে ফজরের নামায পড়েছেন। বস্তুতঃ ঈমানদার ব্যক্তির উচিত—সে সবসময় উযূ অবস্থায়

থাকবে, উযূ ভঙ্গ হয়ে গেলে তৎক্ষণাৎ পুনরায় উযূ করে দু'রাকাত নফল পড়বে ; সবসময় কেবলামুখী হয়ে বসার চেষ্টা করবে, অন্তরে এই ধ্যান-খেয়াল জাগরুক রাখবে যে, পেয়ারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার সম্মুখে উপস্থিত। এই ধ্যানমগ্নতার ফলে প্রতিটি কাজে প্রশান্তি অনুভব হবে, দুঃখ-মুসীবতে ধৈর্যধারণ সহজ হবে। মুসলমানের নীতি হচ্ছে,—সে কাউকে দুঃখ দিবে না, শত্রুর মুকাবেলা করবে না, বরং দোস্ত-দুশমন নির্বিশেষে সকলের জন্য নেক দো'আ করবে। সে কখনো অহংকার ও আত্মসমর্থনের ব্যাধিতে আক্রান্ত হবে না। স্বীয় আমল-ইবাদতের জন্য বড়াই ও আত্মম্ভরিতায় লিপ্ত হবে না। কেননা এটা কোন মুসলমানের নীতি বা চরিত্র নয় ; বরং শয়তানের খাসলত। মুসলমান সর্বদা বিনয়ী থাকবে ; নিজেকে নিকৃষ্ট জ্ঞান করবে, নেক বান্দাদেরকে ভক্তি ও শ্রদ্ধার চোখে দেখবে। কেননা যার অন্তরে নেক লোকদের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা নাই, তাকে আল্লাহ্ তা'আলা পুণ্যবান লোকদের সাহচর্য থেকে বঞ্চিত করে রাখেন। আর যে ব্যক্তি আমল ও ইবাদতের মান-মর্যাদা ও মূল্যায়ন সম্পর্কে অজ্ঞ, সে হৃদয়ের প্রশান্তি ও সুরুচি হতে বঞ্চিত থাকে।

হযরত ফুযাইল ইবনে ইয়ায (রহঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল ঃ 'হে আবূ আলী (তাঁর উপনাম)! কি কি গুণের সমাবেশ হলে একজন মানুষকে সৎ বলা যায়? তিনি উত্তর করেছেন ঃ 'যখন তার অন্তরে পরোপকার ও কল্যাণ-কামনার গুণ বিদ্যমান থাকবে এবং আল্লাহ্র প্রতি ভয় থাকবে, যবানে সর্বদা সে সত্য ও হক বলবে এবং দেহের সমগ্র অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সৎকাজে ব্যপৃত রাখবে, তখন তাকে নেক ও সৎ বান্দা হিসাবে আখ্যায়িত করা যায়।'

মি'রাজের সময় হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ্ পাক বলেছেন ঃ 'হে আহমদ (আল্লাহ্র রাসূলের অপর নাম)! তুমি যদি দুনিয়ার সকল মানুষ অপেক্ষা অধিক মুত্তাকী হতে চাও, তা' হলে দুনিয়ার ব্যাপারে তুমি অনাসক্ত ও উদাসীন হয়ে যাও এবং আখেরাতের ব্যাপারে উৎসাহী ও উদ্গ্রীব হও।' হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরয করলেন ঃ 'আয় আল্লাহ্! আমি দুনিয়ার ব্যাপারে কিভাবে অনাসক্ত হবো?' আল্লাহ্ পাক বললেন—'তুমি তোমার পানাহার ও পরিধানের জন্য

দুনিয়ার দ্রব্য-সামগ্রী হতে কেবল এতটুকু গ্রহণ কর, যতটুকু তোমার একান্ত প্রয়োজন, আগত দিনের জন্য তুমি কপর্দক পরিমাণও জমা রেখো না, আর সর্বদা আমার যিক্‌রে মগ্ন থাক।' প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরয করলেন ঃ 'আমি সর্বদা যিক্‌র কিভাবে করবো?' আল্লাহ্ তা'আলা বললেন ঃ 'মানব কোলাহল থেকে নিরবতায় স্থান গ্রহণ কর, অধিক নামায পড়াকেই নিদ্রার স্থলাভিষিক্ত করে নাও এবং অভুক্ত থাকাকেই পানাহার মনে কর।'

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

اَلزُّهْدُ فِى الدُّنْيَا يُرِيْحُ الْقَلْبَ وَالْبَدَنَ۔

'দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি মানবের দেহ-মনে সুখ ও প্রশান্তি আনয়ন করে।'

পক্ষান্তরে দুনিয়ার প্রতি আসক্তি দুশ্চিন্তা ও দুঃখ-কষ্ট বৃদ্ধি করে। বস্তুতঃ দুনিয়ার মহব্বত সকল পাপাচারের মূল এবং দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি ও ঘৃণা সকল নেকী ও কল্যাণের উৎস।

একদা আল্লাহ্র এক পুণ্যবান বান্দা কোথাও যাওয়ার সময় একটি সমাবেশের প্রতি লক্ষ্য করলেন ; তিনি দেখলেন, একজন চিকিৎসক সমবেত লোকজনের বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা করছেন এবং রকমারী ঔষধের কথা বাত্লিয়ে দিচ্ছেন। চিকিৎসককে উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন ঃ 'হে দৈহিক ব্যাধির চিকিৎসক! তুমি কি আত্মার ব্যাধিরও চিকিৎসা করতে পার?' চিকিৎসক বললেন—'হাঁ ; আপনার রোগ বলুন।' তিনি বললেন ঃ 'পাপ-পংকিলতার কারণে আমার আত্মা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে গেছে ; ফলে আমার অন্তর খুবই শক্ত ও কঠিন হয়ে আছে—এর কি চিকিৎসা হতে পারে?' চিকিৎসক বললেন—'এর এলাজ হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার সম্মুখে বিনয়-বিনম্রচিত্তে অবনত মস্তকে কান্নাকাটি করুন ; দৃশ্য-অদৃশ্য নির্বিশেষে সর্বজ্ঞানী মহান আল্লাহ্র তরফ থেকে আপনার আত্মার রোগ নিরাময়ের জন্য এটাই একমাত্র চিকিৎসা।' একথা শুনে পুণ্যবান লোকটি চিৎকার দিলেন এবং রোদন করতে করতে ফিরে আসলেন আর বলতে থাকলেন—'তুমি অতি উত্তম চিকিৎসক, আমার আত্মার সঠিক এলাজ তুমি করেছো।' চিকিৎসক

বললেন—'স্মরণ রাখবেন, এ চিকিৎসা ঐ ব্যক্তির জন্য, যে অতীত জীবনের কৃত পাপকর্ম থেকে সঠিক তওবা করে আন্তরিকভাবে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে ফিরে এসেছে।'

জনৈক ব্যক্তি একদা একটি কৃতদাস খরিদ করেছিলো। কৃতদাস মনিবকে বললো, 'হে মনিব! আপনার কাছে আরজ করার মত আমার তিনটি শর্ত রয়েছে ঃ এক,— ফরয নামাযের সময় উপস্থিত হলে, আপনি আমাকে ইবাদত হতে বিরত রাখবেন না। দুই,—দিনের বেলায় আপনি আমাকে যে কোন কাজের নির্দেশ দিন, তা' আমি উৎফুল্লচিত্তে পালন করবো ; কিন্তু রাতে আমাকে কোন কাজের হুকুম করবেন না। তিন,—আপনার বাড়ীতে আমার জন্য একটি স্বতন্ত্র নির্জন কোঠার ব্যবস্থা করে দিন, সেখানে আমাকে ছাড়া আর কেউ প্রবেশ করতে পারবে না।' মনিব তার সব কয়টি শর্ত মেনে নিলো এবং বললো,—'তোমার পছন্দ মত একটি কামরা বেছে নাও'। অতঃপর সে অতি ক্ষুদ্র ও ভগ্ন একটি কামরা পছন্দ করে নিলো। মনিব জিজ্ঞাসা করলো—তুমি এই ক্ষুদ্র ও ভগ্ন কামরাটি কেন বেছে নিলে? সে বললো ঃ 'হে মনিব! আপনি কি জানেন না যে, ভগ্ন ও উজাড় কামরা আল্লাহ্ পাকের যিক্‌রের দ্বারা বাগিচায় পরিণত হয়?' অতঃপর সে উক্ত কামরায় অবস্থান করতে লাগলো ; দিনের বেলা সে মনিবের খেদমত করতো এবং রাতে আল্লাহ্‌র ইবাদতে মশগুল থাকতো। এভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর একদা মনিব পায়চারি করতে করতে গোলামের হুজ্‌রার কাছে পৌঁছে দেখতে পেলো—কামরার অভ্যন্তরে একটি উজ্জ্বল আলোকরশ্মি চমকাচ্ছে এবং গোলাম সিজ্‌দায় পড়ে আছে, আর তার মাথা বরাবর যমীন থেকে আসমান পর্যন্ত একটি নূরের কিন্দীল (লণ্ঠন বা প্রদীপ) ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে। এদিকে গোলাম অত্যন্ত নিবিষ্টচিত্তে আল্লাহ্‌র কাছে রোদন করে মুনাজাত করছে ঃ 'আয় আল্লাহ্! আপনি আমার উপর মনিবের খেদমত লাযেম ও অপরিহার্য করে দিয়েছেন। যদি আমার উপর এ দায়িত্ব না থাকতো, তা' হলে আমি শুধু আপনার ইবাদতেই মশগুল থাকতাম। অতএব হে আল্লাহ্! আমার এই অপারগতা আপনি কবুল করে নিন।' এদিকে মনিব এ সবকিছু অবলোকন করছিল। অবশেষে সকাল বেলা সেই কিন্দীল বা নূরের জ্যোতি বিলীন হয়ে গেলো এবং গৃহের ছাদ আবার পূর্বের মত হয়ে

গেলো। অতঃপর মনিব সেখান থেকে প্রস্থান করে তার স্ত্রীর নিকট ঘটনাটি বর্ণনা করলো। পরদিন রাতে মনিব স্ত্রীকে নিয়ে গোলামের গৃহের দরজায় দাঁড়িয়ে দেখলো—পূর্বের ন্যায় তাঁর মাথা হতে আসমান পর্যন্ত নূরের কিন্দীল ঝুলছে আর সে সিজদায় পড়ে কান্নাকাটি করছে। এভাবে রাত প্রভাত হলে তারা গোলামকে ডেকে বললো—তোমাকে আমরা আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আযাদ করে দিলাম ; তুমি এখন আমাদের দায়-দায়িত্ব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও স্বাধীন, যাতে তুমি আল্লাহ্‌র দরবারে যে উযর পেশ করেছিলে, তা' তোমার জন্য আল্লাহ্‌র ইবাদতে বাধা না হয়। এরপর গোলাম আকাশের দিকে মস্তক উত্তোলন পূর্বক নিম্নের পংক্তিটি পড়লো ঃ

يَا صَاحِبَ السِّرِّ إِنَّ السِّرَّ قَدْ ظَهَرَا
وَلَا أُرِيدُ حَيَاتِيْ بَعْدَ مَا اشْتَهَرَا

'হে গোপন রহস্যের মালিক! আমার গোপন ভেদ প্রকাশিত হয়ে গেছে, এখন আমি আর বেঁচে থাকতে চাই না।'

তারপর সে বললো ঃ 'হে আল্লাহ্! আমি আপনার কাছে মৃত্যু প্রার্থনা করি, আমাকে এ মুহূর্তেই দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নিন।' এই দো'আর পরমুহূর্তেই সে মাটিতে লুটে পড়লো এবং চিরদিনের জন্য দুনিয়া থেকে বিদায় নিলো। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌র আশেক ও নেক সাধকদের অবস্থায়ই এরূপ হয়ে থাকে ; এ থেকে আমাদের সবক হাসিল করা উচিত।

'যাহ্‌রুর-রিয়াদ' কিতাবে আছে—হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামের সাথে এক ব্যক্তির গভীর বন্ধুত্ব ছিল। একদা সে বললো ঃ 'হে মূসা! আপনি দো'আ করে দিন, যাতে আমি আল্লাহ তা'আলাকে তাঁর যথার্থ হক অনুযায়ী চিন্‌তে পারি।' মূসা আলাইহিস্ সালাম দো'আ করে দিলেন এবং তা' আল্লাহর দরবারে কবূল হলো। অতঃপর লোকটি পাহাড়ী এলাকায় গিয়ে বন্য জীব-জন্তুর সাথে মিশে গেলো। মূসা আলাইহিস্ সালাম বন্ধুকে না পেয়ে আল্লাহর নিকট দো'আ করলেন ঃ 'ইয়া আল্লাহ! আমি আমার ভ্রাতা ও বন্ধুকে হারিয়ে ফেলেছি ; আমাকে তার সংবাদ জানিয়ে দিন।' উত্তর আসলো, 'হে মূসা! আমার সত্যিকার মা'রেফাত যার হাসিল হয়েছে, সে কখনও মাখলুকের

সাহচর্যে থাকতে পারে না।'

বর্ণিত আছে—একদা হযরত ঈসা ও ইয়াহ্ইয়া আলাইহিমাস্ সালাম বাজারে পায়চারি করছিলেন। এ সময় হঠাৎ একজন মহিলার গায়ে তাঁদের ধাক্কা লাগে। হযরত ইয়াহ্ইয়া আলাইহিস সালাম বললেন ঃ 'খোদার কসম, এ বিষয়ে আমি কিছুই বলতে পারি না ; আমি সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক ছিলাম।' হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম বললেন ঃ 'সুবহানাল্লাহ! আপনার সম্পূর্ণ দেহটি আমার সাথে ; অথচ আপনার অন্তঃকরণ এ সময় কোথায় ঘুরছে?' তিনি বললেন ঃ 'ভাই! আমার অন্তর যদি এক মুহূর্তের জন্যেও আল্লাহকে ছাড়া অন্য কারও কল্পনা করে, তা'হলে আমার এরূপ মনে হয় যে, আমি আল্লাহকে চিনি নাই।'

সূফিয়ায়ে কেরাম বলেন ঃ 'আল্লাহর সঠিক পরিচয় প্রাপ্তির লক্ষণ হচ্ছে,—দুনিয়া ও আখেরাত উভয়কে পরিত্যাগ করা এবং একমাত্র মাওলার জন্য নিবেদিত প্রাণ হয়ে যাওয়া। খোদার প্রেমিক মহব্বতের অমৃত সুরায় এমন বিভোর-সংজ্ঞাহীন হবে যে কিয়ামতে খোদার দীদারের আগে হুঁশে আসবে না। এটা বান্দাকে খোদার পক্ষ হতে দেওয়া এক বিশেষ নূর।'

অধ্যায় ঃ ১২

ইবলীস ও ইবলীসের শাস্তি

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ ۝

'তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তা'হলে আল্লাহ্ তা'আলা কাফেরদেরকে ভালবাসেন না।' (আলি-ইমরান ঃ ৩২)

অর্থাৎ—তারা যদি আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের ইতা'আত ও আনুগত্য হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তা'হলে আল্লাহ তা'আলা এহেন কাফেরদের ক্ষমা করবেন না এবং তাদের তওবাও কবুল করবেন না। যেমন ইবলীসের তওবা তার কুফ্র ও অহংকারের কারণে কবুল করেন নাই। এর তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, হযরত আদম (আঃ) নিজের অপরাধ স্বীকার করেছিলেন এবং এজন্যে তিনি লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়েছিলেন ; পরন্তু নিজেকে মালামত ও ভৎর্সনা করেছিলেন। অথচ হযরত আদম আলাইহিস্ সালামের কৃতকর্মটি মূলতঃ কোনরূপ গুনাহ্ ছিল না। কেননা আম্বিয়া আলাইহিমুস্ সালাম সর্বপ্রকার গুনাহ্ থেকে পবিত্র হয়ে থাকেন ; কখনও তাঁদের দ্বারা কোনরূপ গুনাহের কাজ অনুষ্ঠিত হয় না। এমনকি অধিকতর সঠিক অভিমত অনুযায়ী নবুওয়াত প্রাপ্তির পরে তো বটেই, নবুওয়াতের পূর্বেও তাঁরা নিষ্পাপ থাকেন তথাপি অনুষ্ঠিত কার্যটি যেহেতু বাহ্যতঃ গুনাহের সদৃশ ছিল, তাই হযরত আদম ও হাউওয়া আলাইহিমাস সালাম উভয়ই সেটাকে স্বীকার করেছিলেন এবং আল্লাহ্র কাছে এভাবে ক্ষমা চেয়ে দো'আ করেছিলেন ঃ

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝

'হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা নিজেদের উপর জুলুম করেছি, যদি

আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করেন, তবে আমরা অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাবো।' (আ'রাফ ঃ ২৩)

তাঁরা আল্লাহ্ তা'আলার রহমত ও অনুগ্রহ থেকে নিরাশ না হয়ে তাৎক্ষণিকভাবে তওবা, লজ্জা ও অনুতাপ প্রকাশ করেছিলেন। যেমন আল্লাহ্ পাক পবিত্র কুরআনে নির্দেশ করেছেন ঃ

لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ط

'তোমরা আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না।' (যুমার ঃ ৫৩)

পক্ষান্তরে, ইবলীস না গুনাহ্ স্বীকার করেছে, না লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়েছে, না নিজেকে ভৎর্সনা করেছে, না আল্লাহ্‌র রহমতের কোন আশা করেছে ; বরং সে রীতিমত আস্ফালন করতে শুরু করেছে। অতএব যে ব্যক্তির অবস্থা এই ইবলীসের মত হবে, তার তওবা কবূল হবে না। আর যার অবস্থা হযরত আদম আলাইহিস্ সালামের ন্যায় হবে, তার তওবা কবূল হবে। কেননা যে গুনাহ্ লোভ-লালসা থেকে উৎপন্ন হয়, সেটার ক্ষমা ও মার্জনার আশা করা যায় ; কিন্তু যে গুনাহ্ অহংকার ও আত্মম্ভরিতার কালকুট বিষ থেকে উৎসারিত হয়, সেটার ক্ষমা ও ক্ষতিপূরণের আশা করা যায় না। মূলতঃ হযরত আদম আলাইহিস্ সালামের ত্রুটির উৎস ছিল (ফল ভক্ষণের) লোভ আর ইবলীসের পাপ ও অবাধ্যতার কারণ ছিল তার অহংকার ও আত্মম্ভরিতা।

বর্ণিত আছে,—একদা পাপিষ্ঠ ইবলীস হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামের নিকট উপস্থিত হয়ে বলতে লাগলো ঃ 'হে মূসা! আপনাকে আল্লাহ্ তা'আলা রিসালত ও নবুওয়াতের সম্মানে ভূষিত করেছেন, আপনার সাথে সরাসরি কথা বলেছেন।' হযরত মূসা (আঃ) বললেন ঃ 'তা অবশ্যই ; কিন্তু তোমার উদ্দেশ্য কি? তুমি আমার কাছে কি চাও? এবং তুমি কে?' ইবলীস বললো,– 'হে মূসা! আপনি আপনার প্রভুর কাছে বলুন যে, আপনার একজন মাখ্লূক তওবা করতে চায়।' তখন আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামের নিকট ওহী প্রেরণ করলেন ঃ 'হে মূসা! তুমি তাকে বলে দাও যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমার দরখাস্ত শ্রবণ করেছেন। অতঃপর তাকে হুকুম কর, সে যেন আদম আলাইহিস্ সালামের কবরকে সম্মুখে রেখে সিজদা করে। যদি

সে এভাবে সিজদা করে নেয়, তা' হলেও আমি তার তওবা কবূল করে নিবো এবং তার সমস্ত গুনাহ্ মাফ করে দিবো।' হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম ইবলীসকে এভাবে বললে সে ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে গেল এবং দম্ভের সাথে বলতে লাগলো,—'হে মূসা! আমি আদমকে বেহেশ্‌তে সিজদা করি নাই, এখন তার মৃত্যুর পর আমি তাকে সিজদা করতে পারি না।'

বর্ণিত আছে,—ইবলীসকে যখন দোযখে নিক্ষেপ করার পর কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে, তখন জিজ্ঞাসা করা হবে,—'আল্লাহ্‌র আযাব কেমন হচ্ছে?' সে বলবে,—'অত্যন্ত কঠিন, যারপর আর কঠিন আযাব হতে পারে না।' এ সময় ইবলীসকে বলা হবে, 'হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম তো বেহেশ্‌তে আছেন, তুমি এখনও তাকে সিজদা করে মাফ চেয়ে নাও, তোমাকে মাফ করে দেওয়া হবে।' এ কথার পরেও সে হযরত আদমকে সিজদা করতে অস্বীকার করবে। অতঃপর অন্যান্য দোযখীদের তুলনায় তার আযাব সত্তর গুণ বৃদ্ধি করে দেওয়া হবে।

এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে,—আল্লাহ্ তা'আলা ইবলীসকে এক লক্ষ বৎসর পর পর দোযখ হতে বাহিরে আনয়ন করবেন এবং হযরত আদম (আঃ)–কেও বাহিরে আনা হবে। অতঃপর তাকে সিজদা করার হুকুম করা হবে। তখনও বারবার ইবলীস হযরত আদমকে সিজদা করতে অস্বীকার করবে। এভাবে তাকে পুনঃ পুনঃ জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। প্রিয় সাধক! তুমি যদি ইবলীসের প্রতারণা ও ষড়যন্ত্র হতে রক্ষা পেতে চাও, তা' হলে মাওলা পাকের সান্নিধ্যে আশ্রয় গ্রহণ কর এবং আত্মরক্ষার জন্য তার কাছেই প্রার্থনা কর।

ক্বিয়ামতের দিন আগুনের একটি কুরসী পাতা হবে, এবং ইবলীসকে সেই কুরসীর উপর বসানো হবে। তখন সে গর্দভের ন্যায় চিৎকার করতে থাকবে। এ চিৎকার শুনে অন্যান্য শয়তান ও কাফেরগণ তার চতুষ্পার্শ্বে সমবেত হবে। তখন সে বলবে,—'হে দোযখের অধিবাসীরা! তোমরা কেমন পেলে? তোমাদের প্রভু যে ওয়াদা করেছিলেন, তা' বাস্তবে পেয়েছো?' তারা বলবে,—'আমাদের প্রভু যা বলেছিলেন, তা' সবই সত্য এবং আমরা সবই বাস্তবে পেয়েছি।' ইবলীস পুনরায় বলবে ঃ 'আজ আমি আল্লাহ্‌র রহমত ও অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হয়ে গেছি।' অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাগণকে

হুকুম করবেন,—'ইবলীস এবং ইবলীসের সকল অনুসারীকে লোহার গুরুজ দিয়ে শাস্তি প্রদান কর।' অতঃপর এভাবে তারা চল্লিশ বছর পর্যন্ত জাহান্নামের গভীর তলদেশের দিকে ধাবিত হতে থাকবে এবং কস্মিনকালেও তাদেরকে সেখান থেকে বের করা হবে না। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করুন, আমীন।

বর্ণিত আছে,—ক্বিয়ামতের দিবস ইবলীসকে হাজির করার পর আগুনের কুরসীতে বসানো হবে, তার গলায় অভিশাপের বেড়ী পরিয়ে দেওয়া হবে। আল্লাহ্ তা'আলা 'যাবানিয়া (জল্লাদ ফেরেশ্তাদের)'-কে হুকুম করবেন যে, 'তাকে হেঁচড়িয়ে টেনে কুরসী হতে অপসারণ করে জাহান্নামে নিক্ষেপ কর।' ফেরেশ্তাগণ তাকে ধরে অনেক চেষ্টা করবে কিন্তু জাহান্নামে ফেলতে পারবে না। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস্ সালামকে হুকুম করবেন— আশি হাজার ফেরেশ্তার সহযোগিতায় তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করতে ; কিন্তু তিনিও এতে ব্যর্থ হবেন। অনুরূপ হযরত ইস্রাফীল আলাইহিস্ সালামও ব্যর্থ হবেন। হযরত আয্রাঈল আলাইহিস্ সালামকে হুকুম করা হবে এবং প্রত্যেক ফেরেশ্তার সাথে আরও আশি হাজার করে ফেরেশ্তা সহযোগী হবে ; কিন্তু তিনিও এভাবে ব্যর্থ হবেন। এরপর আল্লাহ্ পাক বলবেন ঃ 'আমি যত ফেরেশ্তা সৃষ্টি করেছি, তৎসমুদয়ের দ্বিগুণ ফেরেশ্তাও যদি এ কাজে প্রয়াস চালায়, তথাপি ইবলীসকে এখান থেকে অপসারণ করতে পারবে না। কারণ, আমি তার গলায় লা'নত ও অভিশাপের বেড়ী পরিয়ে দিয়েছি।

বর্ণিত আছে,—দুনিয়ার আসমানে ইবলীসের নাম ছিল আবেদ (ইবাদত-গুযার), দ্বিতীয় আসমানে নাম ছিল যাহেদ (সর্বস্ব ত্যাগী), তৃতীয় আসমানে নাম ছিল আরেফ (খোদার যথার্থ পরিচয়প্রাপ্ত), চতুর্থ আসমানে ছিল ওলী (আল্লাহ্র দোস্ত), পঞ্চম আসমানে ছিল তক্বী (মুত্তাকী-পরহেযগার), ষষ্ঠ আসমানে ছিল খাযেন (সম্পদ সংরক্ষক-আমানতদার), এবং সপ্তম আসমানে ছিল আযাযীল ; কিন্তু লাউহে মাহ্ফূযে তার নাম ছিল ইবলীস (নিরাশ ও হতাশাগ্রস্ত), সে নিজের শেষ পরিণাম সম্পর্কে সম্পূর্ণ গাফেল ও বে-খবর ছিল। আল্লাহ্ তা'আলা যখন তাকে সিজদা করার হুকুম করলেন, তখন সে বলেছে,—'আদমকে আপনি আমার উপর প্রাধান্য দিয়েছেন? আমি

তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ; আমাকে আগুন দিয়ে সৃষ্টি করেছেন আর তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি দিয়ে।' আল্লাহ্ তা'আলা বলছেন,—'আমি আমার অভিপ্রায়ে যা ইচ্ছা তা' করে থাকি।' ইবলীস তখন নিজেকে বড় এবং বুযুর্গ জ্ঞান করে অহংকার ও ঘৃণা-অবজ্ঞার সাথে হযরত আদম আলাইহিস্ সালামের দিকে পিঠ ফিরিয়ে দম্ভভরে সটান দাঁড়িয়ে থাকে। অথচ ফেরেশ্তাগণ আল্লাহ্র হুকুমের পর দীর্ঘকাল পর্যন্ত হযরত আদমের জন্য সিজদাবনত অবস্থায় পড়েছিলেন। ফেরেশ্তাগণ সিজদা শেষ করে মাথা উত্তোলন করার পর যখন দেখলেন, ইবলীস সিজদা করে নাই, তখন তারা আল্লাহ্র হুকুম পালনে তাওফীক প্রাপ্তির জন্য দ্বিতীয়বার শুক্রানা সিজদা আদায় করেন। কিন্তু ইবলীস সেই পূর্ববৎ হযরত আদম থেকে মুখ ফিরিয়ে সদম্ভে দাঁড়িয়ে থাকে ; আল্লাহ্র আনুগত্য ও হুকুম পালনের মোটেও চিন্তা করে নাই ; না-ফরমানী ও অবাধ্যতার উপর কিঞ্চিৎ লজ্জাবোধ করে নাই। এই কৃতকর্মের ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে চতুষ্পদ জন্তুর আকৃতিতে শূকরের ন্যায় উপুড় করে দেন। তার মাথা উটের মাথার ন্যায়, বক্ষভাগ বৃহদাকার উষ্ট্রের কুঁজের ন্যায় করে দেন, মুখমণ্ডল বানরের চেহারায় বিকৃত করে দেন। চক্ষুদ্বয় চেহারার প্রস্থের দিকে সংকীর্ণ করে দৈর্ঘ্যের দিকে বাড়িয়ে লম্বা করে দেন—তখন চক্ষুদ্বয়ে বিশ্রী ফাটা দাগ পরিদৃষ্ট হতে থাকে। তার নাসিকার ছিদ্রদ্বয় সিঙ্গাকারী (দুষিত রক্ত বের করার কারিগর) ব্যক্তির লুটার ন্যায় খোলা দেখা যায়। তার ঠোঁট দু'টি গরুর ঠোঁটের আকৃতিতে পরিবর্তন করে দেন এবং দাঁতগুলো শূকরের দাঁতের মত বাহিরের দিকে বের হয়ে থাকে। তার মুখমণ্ডলে দাঁড়ির মাত্র সাতটি পশম বাকী রয়েছে। তাকে জান্নাত থেকে ধাক্কা দিয়ে বের করে দেওয়া হয়েছে। বরং আসমান ও যমীনের সকল আবাদ এলাকা হতে বের করে অনাবাদী বিজন প্রান্তরে বিতাড়িত করা হয়েছে। মনুষ্য আবাসে এখন সে লুকিয়ে লুকিয়ে আসে। হাশরের কর্মফল দিবস পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা তাকে মালঊন ও অভিশপ্ত করে দিয়েছেন ; কারণ সে জঘন্যতম কাফেরে পরিণত হয়েছে। প্রিয় সাধক! এখন চিন্তা করার বিষয়,—এ-তো সে-ই, যে এক সময় মুগ্ধকর রূপ-সৌন্দর্যের অধিকারী ছিল। অতি আকর্ষণীয় চারটি ডানা ছিল তার। অগাধ জ্ঞান-বিদ্যা ও আমল-ইবাদতের অধিকারী ছিল সে। ফেরেশ্তাদের মধ্যে তার উপাধি ছিল 'তাউসুল-মালায়িকাহ্' বা

সৌন্দর্যের ময়ূর। সকলের মান্য-গণ্য ও বরেণ্য ছিল সে। কিন্তু শুধুমাত্র অহংকার ও আত্মম্ভরিতার কারণে কোন কিছুই তার কাজে আসে নাই। এতে শিক্ষণীয় বহুকিছু রয়েছে ; কেবল বাহ্যিক আচার-আচরণ ও আমল-ইবাদতই মুখ্য নয়, আল্লাহ্ তা'আলার ফযল-করম ও মেহেরবানীই হচ্ছে আসল বিষয়।

বর্ণিত আছে,—যখন ইবলীস দুর্ভাগ্যের চরম সীমায় উপনীত হবে, তখন হযরত জিবরাঈল ও মিকাঈল আলাইহিমাস্ সালাম ক্রন্দন করে উঠবেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন, 'তোমরা কি কারণে কাঁদছো?' তাঁরা বলবেন,—'ইয়া আল্লাহ্! আমাদের ভয় হয়,—কখন আমাদের উপরেও এহেন দুর্গতি এসে পড়ে ; এ ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত থাকতে পারছি না।' আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন,—'তোমরা আমা হতে বস্তুতঃই এরূপ ভীত ও শঙ্কিত থাক।'

রেওয়ায়াতে আছে,—একদা ইবলীস বলেছিল ঃ 'পরওয়ারদিগার! আমাকে আদমের কারণে জান্নাত থেকে বহিস্কার করেছেন, আপনি যদি আমাকে ক্ষমতা দান না করেন, তা' হলে আমি তার শত্রুতা ও ক্ষতিসাধন করতে পারবো না।' আল্লাহ্ তা'আলা বললেন ঃ 'আমি তোকে ক্ষমতা দান করলাম।' অর্থাৎ হযরত আদম আলাইহিস্ সালামের সন্তানদের উপর সে ক্ষমতা পেয়ে গেল ; তবে আম্বিয়া আলাইহিমুস্ সালাম মাসূম ও নিষ্পাপ হওয়ার কারণে শয়তান থেকে মাহ্ফুয থাকবেন ; তাঁদের উপর তার কোন ক্ষমতা চলবে না। ইবলীস বললো,—'আমাকে আরও অধিক ক্ষমতা দান করুন।' আল্লাহ্ তা'আলা বললেন ঃ 'এক একজন আদম সন্তানের শত্রুতার জন্য তোর দুই-দুইটি সন্তান জন্ম নিবে।' সে বললো,—'আরও অধিক করে দিন।' আল্লাহ্ বল্লেন,—'তাদের বক্ষদেশ তোর আবাসস্থল হবে এবং তাদের শিরায় শিরায় তোর চলার ক্ষমতা থাকবে।' সে বললো,—'আরও অধিক করে দিন।' আল্লাহ্ তা'আলা বললেন,—'আদম সন্তানের বিরুদ্ধে তোর অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী নিয়ে মেতে উঠ্, তোর সর্ববিধ সহযোগীদের নিয়ে তাদের ক্ষতিসাধনে মত্ত হয়ে যা, তাদেরকে ধন-সম্পদ উপার্জনে, জীবিকা নির্বাহে হারাম ও ঘৃণ্য কাজে লিপ্ত করার প্রয়াস চালিয়ে যা। তাদের সন্তান-সন্ততির ব্যাপারে হারাম উপায়—যথা, ঋতুকালীন সময়ে স্ত্রীগমণে

উদ্বুদ্ধকরণ, সন্তান-সন্ততির শিরকী নাম রাখা, যেমন আবদুল উয্যা ইত্যাদি—অবলম্বনে প্রতারিত কর। অনুরূপ, ভ্রান্ত ধর্ম ও মতবাদ পেশ করে গর্হিত ও কলুষিত বাক্য ও কার্যাবলীর দ্বারা তাদেরকে পথভ্রষ্ট কর, যেমন মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দান, মুর্তিপূঁজার জন্য উদ্বুদ্ধ করে একথা বলা যে, এরা তোমাদের জন্য সুপারিশ করবে, অথবা বাপ-দাদার বুযুর্গীর দ্বারাই নাজাত পেয়ে যাবে কিংবা দীর্ঘদিন বাঁচার আশা দিয়ে তওবা থেকে বিরত রাখা ইত্যাদি। এসবকিছু আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বান্দার সাবধানতার জন্য করা হয়েছে।

অপরদিকে হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম আরজ করেছেন ঃ 'হে পরওয়ারদিগার! 'আপনি ইবলীসকে আমার আওলাদ ও সন্তান-সন্ততির উপর ক্ষমতাবান করে দিয়েছেন ; এখন আপনার তাওফীক ও সাহায্য ছাড়া রক্ষা পাওয়ার কোন উপায় নাই।' আল্লাহ্ তা'আলা বললেন,—'তোমার প্রতিটি সন্তানের সাথে একজন করে সংরক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক ফেরেশ্তা নিয়োজিত থাকবে।' আদম (আঃ) বললেন,—'ইয়া আল্লাহ্! আমাদেরকে আরও অধিক সাহায্য করুন।' আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,—'যতক্ষণ পর্যন্ত আদম সন্তানের দেহে প্রাণ থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের জন্য তওবার দরজা খোলা থাকবে।' হযরত আদম (আঃ) বললেন,—'আরও সাহায্য করুন।' আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ 'আমি আদম-সন্তানকে ক্ষমা করতে থাকবো, তারা যত গুনা-ই করুক না-কেন, আমি কোন পরওয়া করবো না।' হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম বললেন,—'এখন যথেষ্ট হয়েছে।'

ইবলীস আল্লাহ্র দরবারে আরজ করেছে,—'হে আল্লাহ্! আপনি বনী আদমের জন্য রাসূল পাঠিয়েছেন, কিতাব নাযিল করেছেন ; কিন্তু আমার বার্তাবাহক কে হবে?' আল্লাহ্ তা'আলা বললেন ঃ 'তোর বার্তাবাহক হবে গণক বা জ্যোতিষকর্মীরা।' ইবলীস বললো,—'আমার কিতাব কি হবে?' আল্লাহ্ বললেন ঃ 'শরীর গোদানোর নক্শা।' সে বললো,—'আমার কালাম কি হবে?' আল্লাহ্ বললেন ঃ 'মিথ্যা'? সে বললো,—'আমার কুরআন কি হবে? আল্লাহ্ বললেন ঃ 'কবিতা।' সে বললো,—'আমার মুআয্যেন কে?' আল্লাহ্ বললেন ঃ 'বাঁশী ও বাদ্যযন্ত্র।' সে বললো,—'আমার মসজিদ কি?' 'আল্লাহ্ বললেন,—'বাজার'। সে বললো,—'আমার গৃহ কি?' আল্লাহ্ বললেন ঃ

'হাম্মামখানা (গোসলখানা বা স্নানাগার)।' সে বললো,—'আমার খাদ্য কি?' আল্লাহ্ বললেন ঃ 'যে খাদ্যের উপর বিসমিল্লাহ্ পড়া হবে না।' সে বললো,—'আমার পানীয় কি?' আল্লাহ্ বললেন ঃ 'শরাব (মদ)।' সে বললো,—'আমার শিকারের জাল (ফাঁদ) কি?' আল্লাহ্ বললেন ঃ 'মেয়েলোক।'

অধ্যায় ঃ ১৩

আল্লাহ্র বিধানাবলীর আমানত

আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন ঃ

اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ
فَاَبَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا

'আমি আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালার সামনে এই আমানত পেশ করেছিলাম, অতঃপর তারা একে বহন করতে অস্বীকার করলো এবং এতে ভীত হলো।' (আহ্যাব ঃ ৭২)

অর্থাৎ,—আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালা আল্লাহ্র প্রতিনিধিত্বের দায়িত্বভার গ্রহণ করতে অক্ষমতা প্রকাশ করেছে। এরা ভয় ও আশংকা করেছে যে, আমানতের এ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনকরণে কোনরূপ খেয়ানত বা ত্রুটি হলে আমাদের উপর আল্লাহ্র আযাব নেমে আসবে। আলোচ্য আয়াতে 'আমানত' শব্দ দ্বারা ইবাদত-বন্দেগী ও ফরয আমলসমূহকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। যেগুলো পুরাপুরিভাবে পালন করলে চিরস্থায়ী জান্নাতের সুসংবাদ এবং অমান্য করলে জাহান্নামের ভয়াবহ আযাবের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন ঃ 'সহীহ্ অভিমত অনুযায়ী 'আমানত' শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং এক্ষেত্রে দ্বীনের সকল আমল ও আহ্কামই আমানতের অন্তর্ভুক্ত।' এ অভিমতটি উম্মতের প্রায় সকলেই গ্রহণ করেছে। তবে বিষয়টির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে বিভিন্ন মনীষী বিভিন্ন উদাহরণ পেশ করেছেন। যেমন, হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্নে মাস্উদ (রাযিঃ) বলেন ঃ 'উক্ত আয়াতে মাল-সম্পদের আমানত তথা হিফাযতের জন্য কারও কাছে রক্ষিত ধন-দওলতের কথা বলা হয়েছে।' হযরত ইব্নে মাস্উদ থেকে এ ব্যাখ্যাও বর্ণিত হয়েছে যে, এর দ্বারা সমস্ত ফরয কার্যসমূহকে উদ্দেশ্য

করা হয়েছে, যেগুলোর মধ্যে মাল ও সম্পদের আমানতই হচ্ছে সর্বাধিক গুরুত্বের দাবীদার।' হযরত আবুদ্দারদা (রাযিঃ) বলেন,—'জানাবতের (ফরয) গোসলকার্য সম্পন্ন করাও একটি আমানত।' হযরত ইব্‌নে উমর (রাযিঃ) বলেন,—'আল্লাহ্ তা'আলা মানবের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে সর্বপ্রথম লজ্জাস্থান সৃষ্টি করেছেন এবং বলে দিয়েছেন,—'হে মানব! এটা আমানত, যা আমি তোমার কাছে রেখেছি ; অবৈধ ব্যবহারে এতে কোনরূপ খেয়ানত করো না—তুমি যদি এর হিফাযত কর, তা' হলে আমি তোমার হিফাযত করবো।' অতএব লজ্জাস্থান যেমন আমানত, তেমনি কান, চোখ, জিহবা, পেট, হাত, পা প্রভৃতিও আমানত। সুতরাং এগুলোর প্রত্যেকটির হিফাযত অপরিহার্য কেননা 'যে ব্যক্তির আমানতদারী নাই, মূলতঃ তার ঈমানদারীই নাই।'

হযরত হাসান (রাযিঃ) বলেন,—যখন আসমান, যমীন ও পাহাড়সমূহের উপর আমানত পেশ করা হয়েছে, তখন এগুলো এবং এগুলোর উপর যা কিছু ছিল সব কম্পমান হয়ে উঠেছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,—'তোমরা যদি এ আমানত গ্রহণ করে দায়িত্ব পালন করতে পারো, তা' হলে তোমাদেরকে পুরস্কৃত করবো। আর তা' না হলে তোমাদেরকে শাস্তি প্রদান করবো।' তারা বললো,—'হে আল্লাহ্! আমরা এ গুরুতর দায়িত্বের উত্তাপ সহ্য করতে পারবো না।' হযরত মুজাহিদ (রহঃ) বলেন,—'হযরত আদম আলাইহিস্ সালামকে সৃষ্টি করার পর তাঁর সম্মুখে যখন উক্ত আমানত পেশ করা হয়েছে, তখন তিনি বলেছেন,—'পরওয়ারদিগার! আমি আমানতের এ বোঝা গ্রহণ করে নিলাম।'

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, আসমান, যমীন ও পর্বতমালার উপর আমানত পেশ করার পর এদেরকে তা' প্রত্যাখান করার অবকাশ ও এখ্‌তেয়ার দেওয়া হয়েছিল ; এ ব্যাপারে তাদেরকে বাধ্য করা হয় নাই। তা' না হলে উপস্থাপিত আমানত গ্রহণ না করে তাদের কোন গত্যন্তর থাকতো না।

হযরত ক্বাফ্‌ফাল (রহঃ) বলেন,—'বস্তুতঃ উক্ত আয়াতে আসমান, যমীন ও পর্বতমালার উপর আমানত পেশ করার বিষয়টিকে উদাহরণ বা উপমা স্বরূপ উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ, এগুলোর অতিশয় বিশালতার কারণে শরীয়তের বিধি-বিধান পালনের বোঝা যদি এদের উপর চাপিয়ে দেওয়া

হতো,— যেগুলোর উপর শাস্তি ও পুরস্কারের বিষয় নির্ভর করে—তা' হলে এই বিশালতা সত্ত্বেও এদের দ্বারা আমানতের গুরুদায়িত্ব পালন করা সম্ভবপর হতো না ; বরং তারা সম্পূর্ণ অপরাগ ও অক্ষম হতো। অথচ হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম এই মহানতর দায়িত্ব স্বস্কন্ধে গ্রহণ করে নিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ۚ

'কিন্তু মানুষ তা' বহন করলো।' (আহ্‌যাব ঃ ৭২)

রূহ্ জগতে হযরত আদমের পৃষ্ঠদেশ হতে ক্বিয়ামত পর্যন্ত জন্মগ্রহণকারী সকল সন্তান-সন্ততির কাছ থেকে যখন অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয়েছিল, তখনই হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম আমানতের এ দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন।'

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ۙ

নিশ্চয়ই সে জালেম অজ্ঞ।' (আহ্‌যাব ঃ ৭২)

অর্থাৎ,—আমানতের এ বোঝা গ্রহণ করার মুহূর্তে পরিণামের সর্ববিধ আশংকার ব্যাপারে সে অজ্ঞ ছিল অথবা আল্লাহ্ তা'আলার হুকুম-আহ্‌কাম সম্পর্কে সে অনবগত ছিল।

হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন,—'হযরত আদম আলাইহিস্ সালামের সম্মুখে এ আমানত পেশ করার সময় বলা হয়েছিল ঃ 'হে আদম! এ আমানতের সাথে আরও যা' কিছু আছে, সব সহকারে তুমি তা' বহন কর ; এরপর যদি তুমি আমার অনুগত হয়ে চলো, তা'হলে আমি তোমাকে ক্ষমা করবো, আর যদি না-ফরমানী করো, তা' হলে তোমাকে শাস্তি দিবো।' হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম বললেন ঃ 'আমি সবকিছু সহ উক্ত আমানত গ্রহণ করলাম।' অতঃপর আমানত গ্রহণের এ দিনটিতে কেবল আসরের পর থেকে রাত পর্যন্ত সময় অতিবাহিত হয়েছিল, এর মধ্যে হযরত আদম (আঃ) নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল আহার করে ফেলেছিলেন। সেদিন যদি আল্লাহ্ পাকের অপার করুণা তাঁকে আচ্ছাদিত করে না নিতো,

তা' হলে এটা ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ এবং সীমাহীন দুরূহ ব্যাপার ; কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা অনন্ত মেহেরবানী করে হযরত আদম আলাইহিস্ সালামের তওবা কবুল করে নিয়েছেন এবং সঠিক পথ প্রদর্শন করেছেন।

বস্তুতঃ 'আমানত' শব্দটির উৎপত্তিস্থল হচ্ছে 'ঈমান'। অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহ্-প্রদত্ত আমানতের হিফাযত করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার ঈমানের হিফাযত করবেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

لَا اِيْمَانَ لِمَنْ لَا اَمَانَةَ لَهُ وَلَا دِيْنَ لِمَنْ لَّا عَهْدَ لَهُ۔

'আমানত ও সংরক্ষণ গুণ যার নাই, তার ঈমানও নাই। অনুরূপ যে ওয়াদা পূরণ করতে জানে না, সে দ্বীনশূন্য।'

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

يُطْبَعُ الْمُؤْمِنُ عَلٰى كُلِّ خُلُقٍ لَيْسَ الْخِيَانَةَ وَالْكِذْبَ ۔

'প্রকৃত মু'মিন কখনও খেয়ানতকারী ও মিথ্যুক হতে পারে না।'

আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেছেন ঃ 'আমার উম্মত যতদিন পর্যন্ত আমানতের মালকে গণীমতের মালের মত হালাল এবং দান-খয়রাত করাকে জরিমানা বা অর্থদণ্ড মনে না করবে, ততদিন পর্যন্ত তাদের মধ্যে কল্যাণ ও শান্তি বিরাজ করবে।'

তিনি আরও ইরশাদ করেছেন ঃ

اَدِّ الْاَمَانَةَ اِلٰى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ ۔

'লোকের আমানত সঠিকভাবে পৌঁছিয়ে দাও ; এমনকি তোমার সাথে যে খেয়ানত করেছে, তার আমানত পৌঁছাতেও কুণ্ঠিত হয়ো না।'

বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে,—হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

اٰيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ وَاِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ

'মুনাফিকের অলামত তিনটি, মিথ্যা বলা, ওয়াদা বরখেলাফ করা এবং আমানতে খেয়ানত করা।'

অর্থাৎ,—আমানত স্বরূপ তাকে কোন কথা বললে লোকদের মধ্যে সে তা' প্রচার করে খেয়ানতে লিপ্ত হয়, তার কাছে কোন সম্পদ গচ্ছিত রাখলে পরবর্তী সময় সে তা' অস্বীকার করে ; অথবা সে গচ্ছিত মালের হিফাযত করে না কিংবা মালিকের অনুমতি ছাড়া সে তা' ব্যবহার করে। এজন্যে আমানতের হিফাযত করা মুলতঃ নৈকট্য-প্রাপ্ত ফেরেশ্তা, আম্বিয়ায়ে কেরাম, আল্লাহ্র নেক ও পরহেযগার বান্দাগণের অভ্যাস তথা এ অভ্যাসে যারা অভ্যাসী, তারাই প্রকৃত নেক বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহ্ আ'আলা ইরশাদ করেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰى اَهْلِهَا

'নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদেরকে নির্দেশ দেন যে, তোমরা প্রাপ্য আমানতসমূহ প্রাপকদের নিকট পৌঁছিয়ে দাও।' (নিসা ঃ ৫৮)

মুফাস্‌সিরীনে কেরাম উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন যে, শরীয়তের বহু মুলনীতি এ আয়াতে সন্নিবেশিত হয়েছে। এ হুকুমের লক্ষ্য সাধারণ মুসলমানগণ ছাড়াও বিশেষভাবে ক্ষমতাসীন শাসকবর্গও হতে পারে। সুতরাং শাসকবর্গের কর্তব্য হচ্ছে,—মজলুম ও নিপীড়িতদের সাথে ন্যায়-পরায়নতা এবং সর্বদা হক ও সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা। কেননা, এটাও আমানত। সেইসঙ্গে মুসলমানদের ধন-সম্পদের হিফাযত করা এবং এতীমের মালের রক্ষণাবেক্ষণ করাও শাসকের দায়িত্ব। অনুরূপ, উলামায়ে কেরামের আমানত ও দায়িত্ব হচ্ছে,—সর্বসাধারণকে দ্বীনি ইল্ম শিক্ষা দেওয়া, যে দ্বীনের হিফাযতের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা উলামায়ে কেরামকে মনোনীত করেছেন। এমনিভাবে পিতার কর্তব্য ও আমানত হচ্ছে,—সন্তান-সন্ততির তরবিয়ত করা, আখ্লাক ও সচ্চরিত্র শিক্ষা দেওয়া, দ্বীনি তালীম দেওয়া।

হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ

'তোমরা প্রত্যেকেই স্ব স্ব অধীনস্তের জিম্মাদার এবং এ সম্পর্কে তোমাদের প্রত্যেকেরই জবাবদেহী করতে হবে।'

যাহ্রুর-রিয়াদ কিতাবে আছে,—ক্বিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে আল্লাহ্র দরবারে হাজির করা হবে। তাকে আল্লাহ্ তা'আলা জিজ্ঞাসা করবেন ঃ 'তুমি কি অমুক ব্যক্তির আমানত ফেরৎ দিয়েছিলে?' সে বলবে,—'পরওয়ারদিগার! আমি তা' ফেরৎ দেই নাই।' তখন আল্লাহ্ তা'আলা এক ফেরেশ্তাকে হুকুম করবেন ; সে ওই ব্যক্তিকে ধরে জাহান্নামে নিয়ে যাবে এবং সেখানে তাকে সেই আমানত চাক্ষুসভাবে প্রত্যক্ষ করাবে। অতঃপর জাহান্নামে তাকে নিক্ষেপ করার পর সত্তর বৎসর পর্যন্ত সে জাহান্নামের তলদেশের দিকে যেতে থাকবে। এভাবে সে জাহান্নামের সর্বনিম্ন গহ্বরে পৌছবে। তারপর সে আমানতের বস্তুটি নিয়ে উপরের দিকে ধাবমান হবে। এভাবে জাহান্নামের কিনারায় পৌছার পর তার পা পিছলিয়ে যাবে এবং পুনরায় জাহান্নামে পড়ে যাবে। অতঃপর পুনরায় উপরে উঠবে এবং পিছলিয়ে জাহান্নামের নিম্ন গহ্বরে পৌছবে। এভাবে বারবার তার এ অবস্থাই হতে থাকবে। সর্বশেষে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাফা'আতের ওসীলায় আল্লাহ্ পাক তার প্রতি অনুগ্রহ করবেন এবং আমানতের হকদার ব্যক্তি তার প্রতি রাজী হয়ে যাবে।

হযরত সালমা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত যে, একদা আমরা হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বসা ছিলাম। এমন সময় জনৈক ব্যক্তির মৃতদেহ জানাযার নামাযের জন্য হাজির করা হলো। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন ঃ 'এই মৃত ব্যক্তির উপর কি কারও কোন করজ পাওনা আছে?' লোকেরা বললো,—'না' । অতঃপর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানাযার নামায পড়ালেন। কিছুক্ষণ পর অপর এক ব্যক্তির জানাযা হাজির করা হলে তিনি পূর্বের ন্যায় জানতে চাইলেন। লোকেরা বললো,—'হাঁ, এ ব্যক্তির উপর অন্যদের পাওনা আছে।' হুযূর (সঃ) জিজ্ঞাসা করলেন,—'মৃত্যুর পূর্বে সে কি কোন মাল-

সম্পদ রেখে গেছে?' লোকেরা বললো,—'না'। তখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে দিলেন ঃ 'এ ব্যক্তির জানাযা তোমরা পড়ে নাও।'

হযরত ক্বাতাদাহ্ (রাযিঃ) বলেন,—এক ব্যক্তি হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেছিলো,—'হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি যদি আল্লাহ্র রাস্তায় এখ্লাস ও ধৈর্য সহকারে জিহাদ করতে থাকি এবং কাফির-মুশরিকদের ভয়ে পলায়ন না করে বরং তাদের দিকে অগ্রসর হয়ে লড়তে থাকি—এ অবস্থায় যদি আমি নিহত হই, তা' হলে কি আল্লাহ্ তা'আলা আমার গুনাহ্ মাফ করে দিবেন?' হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,—'হাঁ'। একথা শুনে লোকটি প্রস্থান করলে পর পুনরায় তাকে ডেকে বলে দিলেন ঃ 'আল্লাহ্র রাস্তায় শহীদ ব্যক্তির সমস্ত গুনাহ্ মাফ হয়ে যাবে ; কিন্তু অন্যের প্রাপ্য করজ কখনও মাফ করা হবে না।'

অধ্যায় ঃ ১৪

খুশু-খুজু ও নামাযের পূর্ণাঙ্গতা

বিনম্র আত্মসমর্পণ ও একাগ্রতার মাধ্যমে নামাযকে পূর্ণাঙ্গ সুন্দর ও প্রাণবন্ত করার নাম খুশু-খুজু। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন ঃ

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلٰوتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ۝

'মু'মিনগণ সফলকাম হয়ে গেছে,যারা নিজেদের নামাযে বিনয়ী-নম্র।' (মুমিনূন ঃ ১,২)

আয়াতে উল্লেখিত 'খুশু'র ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কেউ কেউ বলেছেন,—'এটা আত্মার সাথে সম্পর্কিত আমল। যেমন ভয় ও শঙ্কা'র সম্পর্ক আত্মার সাথে, তেমনি খুশু'ও একটি আত্মিক আমল। আবার কেউ কেউ খুশু'কে বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে যুক্ত করে এটাকে বাহ্যিক আমল বলে আখ্যায়িত করেছেন। যেমন,—শারীরিক স্থিরতা-ধীরতা, এদিক-সেদিক দৃষ্টি না করা, অহেতুক অঙ্গ সঞ্চালন থেকে বিরত থাকা ; নামাযের ভিতর এগুলো বাহ্যিক আমলের সাথে সম্পর্কিত বিষয়। অনুরূপ, আরও কেউ কেউ বলেছেন, নামাযের জন্য খুশু'র প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য, অর্থাৎ এটা একান্ত ফরয পর্যায়ের বিষয়। অপরদিকে কেউ কেউ খুশু'কে নামাযের জন্য ফযীলত ও মুস্তাহাব বলে অভিহিত করেছেন। ফরয আখ্যাদানকারীগণ দলীল হিসাবে যে হাদীসখানি পেশ করে থাকেন, তা' হচ্ছে,—

لَيْسَ لِلْعَبْدِ مِنْ صَلٰوتِهٖ اِلَّا مَا عَقَلَ -

'নামাযের যতটুকু অংশ বান্দা উপলব্ধি করে আদায় করে, ততটুকু অংশই তার কবুল করা হয়।'

অনুরূপ এ আয়াতটিও উল্লেখ করেছেন ঃ

وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ ۝

'এবং আমার স্মরণার্থে নামায কায়েম কর।' (তোয়াহা ঃ ১৪)

আল্লাহ্র যিক্র করতে হলে যেহেতু গাফলতি ও অবহেলা পরিহার করতে হবে, তাই ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْغٰفِلِيْنَ ۝

'এবং গাফেলদের দলভুক্ত হয়ো না।' (আ'রাফ ঃ ২০৫)

ইমাম বায়হাকী (রহঃ) মুহাম্মদ ইব্নে সীরীন (রহঃ) থেকে রেওয়ায়াত করেছেন যে, উক্ত আয়াতের শানে নুযুল হচ্ছে,—হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে আকাশের দিকে দৃষ্টি উঁচু করে দেখতেন, তাই এ আয়াতে তা' নিষেধ করা হয়েছে। মুসনাদে আবদুর রায্যাকের সূত্রে অতিরিক্ত এ অংশটুকুও রয়েছে,—'অতঃপর তাঁকে নামাযে 'খুশু' অবলম্বন করার হুকুম করা হয়েছে। সেজন্যে তিনি নামাযে দৃষ্টিকে সিজদা'র স্থানে নিবদ্ধ করে রাখতেন।'

হাকেম ও বায়হাকী হযরত আবু হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) থেকে রেওয়ায়াত করেন,— হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযে দৃষ্টিকে আকাশপানে উঁচু করার প্রেক্ষিতে আয়াতখানি নাযিল হয় ; তারপর থেকে তিনি দৃষ্টি নীচু করে নিয়েছেন।

হযরত হাসান (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ 'পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের উদাহরণ হচ্ছে এরূপ যে, তোমাদের কারো বাড়ীর সম্মুখে যদি একটি নহর থাকে এবং তাতে প্রচুর পানি থাকে, সেখানে দৈনিক পাঁচবার যদি সে গোসল করে, তা' হলে তার শরীরে কি সামান্যতম ময়লাও বাকী থাকবে?'

অর্থাৎ,—নামায আদায়ের দ্বারা মানুষ পাপের পঙ্কিলতা হতে মুক্ত ও পবিত্র হয়ে যায় ; কবীরা গুনাহ্ ব্যতীত সর্বপ্রকার গুনাহ্ মাফ হয়ে যায়। নামাযের এ মর্যাদা হাসিল করতে হলে বিনম্র আত্মসমর্পণ ও নিষ্ঠার সাথে নামায আদায় করতে হবে। নামাযে অন্তরকে হাজির রাখতে হবে। অন্যথায় এই নামায—নামায পাঠকারীর মুখে নিক্ষেপ করা হবে। হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

مَنْ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهٗ فِيْهِمَا

بِشَيْءٍ مِّنَ الدُّنْيَا غَفَرَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ـ

'যে ব্যক্তি দুনিয়ার চিন্তা-ধান্দা হতে মুক্ত ও পবিত্র অন্তর নিয়ে দু'রাকাত নামায পড়বে, আল্লাহ্ তা'আলা তার অতীতের সমস্ত গুনাহ্ মাফ করে দিবেন।'

অন্য এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে,—'নামায, হজ্জ, তওয়াফ এবং হজ্জের অন্যান্য বিধানাবলী ইত্যাদি ইবাদত এজন্যে দেওয়া হয়েছে যে, এগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলাকে স্মরণ করা হবে ; কিন্তু এগুলো পালন করতে সময় যে মহান সত্তাকে স্মরণ করা উদ্দেশ্য, যদি তাঁকে স্মরণ না করা হয়, তা' হলে এই যিক্র ও ইবাদত অর্থহীন বস্তুতে পর্যবসিত হয়।'

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেন ঃ

مَنْ لَّمْ تَنْهَهُ صَلٰوتُهُ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ لَمْ يَزْدَدْ مِنَ اللّٰهِ اِلَّا بُعْدًا ـ

'যে ব্যক্তির নামায তাকে অশ্লীলতা ও অপছন্দনীয় কার্য হতে বিরত রাখতে পারলো না, সে ব্যক্তি আল্লাহ্র নৈকট্য হতে ক্রমেই সরে যাচ্ছে।'

হযরত আবূ বকর ইব্নে আবদুল্লাহ্ (রহঃ) বলেছেন ঃ 'তুমি যদি বিনা অনুমতিতে এবং কোন দু'ভাষী ছাড়াই তোমার মাওলার কাছে যেতে ইচ্ছা কর, তা' হলে যেতে পারো।' জিজ্ঞাসা করা হলো, এটা কি করে সম্ভব? তিনি বললেন,—'সুন্দরভাবে পরিপূর্ণরূপে উযূ করে জায়নামাযে দাঁড়িয়ে যাও ; এভাবে তুমি অনুমতি ছাড়াই মাওলার দরবারে প্রবেশ করলে, অতঃপর (নামাযের ক্বিরাআত ও যিক্র-তসবীহের মাধ্যমে) দু'ভাষী ছাড়া কথা বল।'

হযরত আয়েশা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত,—'অনেক সময় এমন হতো যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সাথে কথাবার্তায় মগ্ন রয়েছেন

এবং আমরাও তাঁর সাথে কথাবার্তায় মগ্ন রয়েছি ; ইতিমধ্যে নামাযের সময় উপস্থিত হয়েছে, তখন হুযূরের অবস্থা এমন হতো, যেন তিনি আমাদেরকে চিনেন না এবং আমরাও তাঁকে চিনি না ; আল্লাহ্ তা'আলার আজমত ও প্রতাপ তাঁকে আচ্ছন্ন করে ফেলতো।' হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ 'নামাযে দণ্ডায়মান হওয়ার পর বান্দার শরীর যেমন উপস্থিত থাকে, তার অন্তরও যদি অনুরূপ উপস্থিত না থাকে, তা' হলে আল্লাহ্ তা'আলা এরূপ নামাযের প্রতি মোটেও দৃষ্টিপাত করেন না।'

হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালাম নামাযে দণ্ডায়মান হওয়ার পর ভয়ে এতই কম্পমান হতেন যে, দুর থেকে তাঁর হৃদপিণ্ডের কম্পন শোনা যেতো। হযরত সাঈদ তানূখী (রহঃ) যখন নামাযে দাঁড়াতেন, তখন অবারিত অশ্রু তাঁর গণ্ডদেশ প্রবাহিত হয়ে শশ্রুতে পৌঁছতো।

একদা এক ব্যক্তিকে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায রত অবস্থায় দাঁড়ি সঞ্চালন করতে দেখে বলেছেন,—'যদি এ ব্যক্তির অন্তরে খুশু ও একাগ্রতা থাকতো, তা' হলে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও স্থির থাকতো।'

বর্ণিত আছে,—হযরত আলী (রাযিঃ) যখন নামাযে দাঁড়াতেন, তখন তিনি ভয়ে কম্পমান হতেন এবং মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়ে যেতো। একদা তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো,—'হে আমীরুল-মুমেনীন! নামাযে আপনার এ অবস্থা হয় কেন?' তিনি বলেছেন ঃ 'তখন আল্লাহ্ তা'আলার সেই আমানত আদায়ের সময় এসে যায়, যে আমানত বহন করতে আসমান, যমীন ও পর্বতসমূহ অস্বীকার করেছে ; অথচ আমি তা' বহন করেছি।' হযরত আলী ইব্নে হুসাইন সম্পর্কে বর্ণিত আছে,—তিনি যখন উযূ করতেন, তখন তাঁর চেহারা বিবর্ণ হয়ে যেতো। লোকজন এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলতেন,—'তোমরা কি জাননা যে, এরপর আমি কার দরবারে দণ্ডায়মান হবো?'

হযরত হাতেম আসাম্ম (রহঃ)-কে তাঁর নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে বলেছেন ঃ 'যখন নামাযের সময় উপস্থিত হয়, তখন আমি পরিপূর্ণরূপে উযূ সম্পন্ন করি। অতঃপর জায়নামাযে এসে কিছুক্ষণ স্থির-ধীরভাবে অপেক্ষা

করি। এভাবে সম্পূর্ণ শান্ত হওয়ার পর নামাযের জন্য দণ্ডায়মান হই। তখন আমার অবস্থা এই হয় যে, অন্তরে আমি দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে ধ্যান করি যে, আল্লাহ্র পবিত্র ঘর কা'বা শরীফ আমার সম্মুখে, পুলসিরাত আমার নীচে, বেহেশ্ত আমার ডান পার্শ্বে, দোযখ আমার বামে এবং মৃত্যুর ফেরেশ্তা আয্রাঈল আমার পিছনে। সেইসঙ্গে আমি এ কথাও অন্তরে দৃঢ়বদ্ধ করে নেই যে, এ নামাযই আমার জীবনের শেষ নামায, এর পরেই আমার মৃত্যু। অতঃপর আর নামাযের সুযোগ হবে না। এই ধ্যানমগ্নতা সহকারে আমি আল্লাহ্র প্রতি ভয় ও আশার মধ্যবর্তী স্তরে থেকে নেহায়েত একাগ্রতার সাথে 'আল্লাহু আকবার' বলে নামায আরম্ভ করি। অতঃপর অত্যন্ত স্পষ্ট ও ধীর-স্থিরভাবে ক্বিরাআত পড়ি। রুকু' অত্যন্ত বিনয়ের সাথে করি। সিজদায় পরিপূর্ণ একাগ্রতা ও নিষ্ঠা অবলম্বন করি। বাম নিতম্বে উপবেশন করি, বাম পা বিছিয়ে ডান পা খাড়া রেখে অঙ্গুলি কেবলার দিকে ফিরিয়ে রাখি এবং অন্তরে পরিপূর্ণ এখ্লাস ও আল্লাহ্র ভয় জাগরূক রাখি। এরপরেও আমি বলতে পারি না যে, আমার নামায আল্লাহ্র দরবারে কবুল হয়েছে কিনা?'

হযরত ইব্নে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন,—'আন্তরিক নিষ্ঠা ও ধ্যান সহকারে উপলব্ধি করে দুই রাকাত নামায পড়া গাফেল ও অন্যমনস্ক অবস্থায় সারা রাত্র নামায পড়ার চাইতে উত্তম।'

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ 'আখেরী যমানায় আমার উম্মতের মধ্যে কিছু লোক এমন হবে, যারা মসজিদে উপস্থিত হবে ; কিন্তু সেখানে মজলিস অনুষ্ঠান করে তারা দুনিয়াবী আলোচনায় লিপ্ত হবে ; অন্তরে তাদের থাকবে দুনিয়ার মহব্বত। খবরদার! এসব লোকের সংস্পর্শে যেয়ো না। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট।' হযরত হাসান (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,—হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ 'আমি কি তোমাদেরকে বলবো যে, দুনিয়াতে নিকৃষ্টতম চোর কে? সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! অবশ্যই আপনি আমাদেরকে এ কথা বলে দিন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ 'সবচেয়ে নিকৃষ্ট চোর হচ্ছে ঐ ব্যক্তি, যে নামাযে চুরি করে।' সাহাবীগণ আরজ করলেন, নামাযে চুরি করা হয় কিভাবে? আল্লাহ্র রাসূল বললেন ঃ 'রুকূ' ও সিজদা পরিপূর্ণভাবে আদায় না করাই নামাযে চুরি করা।'

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ 'ক্বিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম নামায পরিত্যাগকারীদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে। যদি কেউ পরিপূর্ণভাবে নামায আদায় করে থাকে তা' হলে তার অন্যান্য বিষয়ের হিসাব সহজ করা হবে। আর যদি ফরয নামাযে কোন ত্রুটি থাকে, তা' হলে আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশ্তাদেরকে বলবেন, দেখ,—আমার বান্দার কোন নফল নামায আছে কিনা ; সেগুলো দিয়ে তার ফরয নামাযের ত্রুটি মুছে দাও।' হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেছেন ঃ 'বান্দার জন্য সর্বোৎকৃষ্ট নেয়ামত হচ্ছে, দুই রাকাত নামাযের তওফীক হওয়া।' হযরত উমর (রাযিঃ) যখন নামাযে দাঁড়াতেন, তখন তাঁর পাঁজর কাঁপতে থাকতো এবং উপর ও নীচের দাঁতগুলো পরস্পর শব্দিত হতে থাকতো। তাঁকে কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে বলতেন, 'আল্লাহ্র আমানত আদায় করার সময় এসে গেছে, জানিনা এই আমানত আমি কিভাবে আদায় করবো।'

খলফ ইব্নে আইয়ূব (রহঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে,—একদা তিনি নামায আরম্ভ করার পর তাঁকে ভীমরুল দংশন করেছিল। ফলে, দংশিত স্থান থেকে রক্ত নির্গত হয় ; কিন্তু তিনি তা' মোটেও অনুভব করতে পারেন নাই। অবশেষে ইব্নে সাঈদ এসে তাঁকে জানালে তিনি কাপড় ধৌত করে নেন। তাঁকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, 'আপনাকে ভীমরুল দংশন করছিল এবং রক্তও প্রবাহিত হচ্ছিল ; অথচ আপনি তা' মোটেও অনুভব করতে পারেন নাই, এর কারণ কি? তিনি বলেছেন,—'যে ব্যক্তি মহা পরাক্রমশালী সত্তার সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়, পিছনে যার মৃত্যুর ফেরেশ্তা বিরাজমান থাকে, বামে থাকে যার দোযখ আর ডানে থাকে বেহেশ্ত এবং পা থাকে পুলসিরাতের উপর, সে-কি এসব বিষয় কখনও অনুভব করতে পারে?'

হযরত ইব্নে যর (রহঃ)-এর হাতে ফোঁড়া হয়েছিল। আধ্যাত্ম জগতে তিনি ছিলেন অতি উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। চিকিৎসকগণ বলেছিল,—'এই মারাত্মক ফোঁড়া হতে নিস্কৃতি পেতে হলে আপনার হাত কেটে ফেলে দিতে হবে। তিনি অনুমতি দিয়েছিলেন। চিকিৎসকগণ বলেছে—'তা' হলে আপনাকে

দড়ি দিয়ে উত্তমরূপে বেঁধে নিতে হবে, নতুবা আপনি অসহনীয় কষ্টে ছুটাছুটি করবেন এবং এতে মারাত্মক ক্ষতি হবে।' তিনি বলেছেন,—না, এসব কিছুর প্রয়োজন নাই ; আমি যখন নামায আরম্ভ করি, তখন তোমরা আমার হাত কেটে নিও।' অতঃপর নামাযরত অবস্থায় তাঁর হাত কাটা হয়েছে এবং তিনি তা' মোটেও অনুভব করেন নাই।

অধ্যায় ঃ ১৫

সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ

হযরত আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ 'আমার উপর যে ব্যক্তি একবার দরূদ শরীফ পড়বে, আল্লাহ্ তা'আলা সে ব্যক্তির নিঃশ্বাস হতে একটি বাদল (মেঘ) সৃষ্টি করেন এবং তাকে বর্ষণ করতে হুকুম করেন। বর্ষণের পর মাটির উপর পতিত প্রতিটি পানিবিন্দু হতে রূপা সৃষ্টি করেন এবং যেসব বিন্দু কাফের লোকদের উপর পতিত হয়, তাদের ঈমান নসীব হয়।'

আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

'তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত, মানব জাতির কল্যাণের জন্যেই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে।' (আলি-ইমরান ঃ ১১০)

হযরত কাল্বী (রহঃ) বলেন ঃ উক্ত আয়াতে অন্যান্য উম্মতের তুলনায় উম্মতে মুহাম্মদীর শ্রেষ্ঠত্বের বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। সেইসাথে এ কথাও স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, এই শ্রেষ্ঠত্ব শুধুমাত্র কতিপয় বিষয়েই নয়; বরং সর্বদিক থেকেই এ উম্মত শ্রেষ্ঠতম উম্মত। আর শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়ে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলেই সমান মর্যাদার অধিকারী। অবশ্য এ উম্মতের লোকজন পারস্পরিক তুলনায় একজনের চাইতে অপরজন অধিক শ্রেষ্ঠ হতে পারে। যেমন সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন পরবর্তীকালের তাবেয়ীগণের তুলনায় অধিক শ্রেষ্ঠ।

আয়াতে উল্লেখিত اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ -এর অর্থ হচ্ছে,—এ উম্মত সমগ্র মানব জাতির হিত কামনা ও কল্যাণ সাধনের জন্যে মনোনীত হয়েছে এবং এটাই এই উম্মতের বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন ঃ

تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ

'তোমরা সৎকাজে নির্দেশ দান করবে ও অন্যায় কাজে বাধা দিবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে।' (আলি-ইমরান ঃ ১১০)

উক্ত আয়াতে এ কথা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, উপরোক্ত গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যের কারণেই এ উম্মত শ্রেষ্ঠতম উম্মত হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। সুতরাং এই উম্মত যদি 'সৎকাজে উপদেশ ও গর্হিত কাজে নিষেধ করা' পরিত্যাগ করে, তা'হলে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব বিনষ্ট হয়ে যাবে। সুতরাং উম্মতে মুহাম্মাদী গোটা মানবজাতির কল্যাণ ও মঙ্গলকামনার ফলশ্রুতিতেই সর্বোৎকৃষ্ট উম্মত। কারণ, তারা মানবকে সৎকাজে উপদেশ দিবে, উৎসাহিত করবে, মন্দ ও গর্হিত কার্যাবলী হতে নিষেধ করবে এবং কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবে। যাতে গোটা মানবগোষ্ঠী শান্তিময় জীবন অতিবাহিত করতে পারে। সুতরাং এ উম্মতের দ্বারা অপরের কল্যাণ সাধিত হওয়াই মূল উদ্দেশ্য। যেমন হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

خَيْرُ النَّاسِ مَنْ يَنْفَعُ النَّاسَ وَشَرُّ النَّاسِ مَنْ يَضُرُّ النَّاسَ۔

'শ্রেষ্ঠতম মানুষ হচ্ছে, যে অপরের উপকার সাধন করে। আর নিকৃষ্টতম হচ্ছে, যে অপরের ক্ষতি করে।'

আয়াতে উল্লেখিত تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ এর অর্থ হচ্ছে, তোমরা আল্লাহ্‌র 'তওহীদ' ও একত্বে বিশ্বাসী এবং এ বিশ্বাসে সুদৃঢ় ও অবিচল। সেইসঙ্গে এ কথাও মনে-প্রাণে স্বীকার কর যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর প্রেরিত নবী ও রাসূল। কেননা যে ব্যক্তি তাঁর নুবুওয়াতকে অস্বীকার করে, সে মূলতঃ আল্লাহ্‌র প্রতিই ঈমান রাখে না। কেননা নুবুওয়াতকে অস্বীকার করার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক উপস্থাপিত সকল মুজিযা তাঁর নিজস্ব ; তাতে আল্লাহ্-প্রদত্ত কিছু নাই। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ

فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذٰلِكَ أَضْعَفُ الْإِيْمَانِ۔

'তোমাদের মধ্যে কেউ যদি মন্দকাজ হতে দেখে, তবে হাত ও শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে তা প্রতিরোধ করা চাই। এতে সক্ষম না হলে, মুখে বাধা দিবে। আর যদি তাও সম্ভব না হয়, তবে অন্ততঃ মনে মনে কাজটিকে ঘৃণা করবে ; এটা ঈমানের সর্বনিম্ন স্তর।'

উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কোন কোন আলেম বলেছেন যে, 'শক্তি ও ক্ষমতাবলে অসৎকাজে প্রতিরোধ করা শাসকবর্গের দায়িত্ব। কথা ও উপদেশের মাধ্যমে প্রতিরোধের দায়িত্ব আলেমগণের। আর অন্তরে ঘৃণা পোষণ করা সাধারণ লোকের কর্তব্য।' আবার কেউ কেউ বলেছেন যে, 'যার যেভাবে ক্ষমতা ও সুযোগ হবে, সেভাবেই সে গর্হিত কাজে নিষেধ ও প্রতিরোধ করবে,—এটাই তার কর্তব্য।

যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

'সৎকর্ম ও খোদাভীতিতে তোমরা একে অন্যের সাহায্য কর, পাপ ও সীমালংঘনের ব্যাপারে একে অন্যের সহায়তা করো না।' (মায়িদাহ ঃ ২)

কাউকে কোন সৎকাজের জন্য উৎসাহিত করা, কল্যাণকর কোন পন্থা বাতলিয়ে দেওয়া, জুলুম-অত্যাচার ও গর্হিত কার্যে সম্ভাব্য প্রতিরোধ গড়ে তোলা, এসব বিষয় মানবের কল্যাণকামিতা ও সাহায্য-সহযোগিতার অন্তর্ভুক্ত।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য এক হাদীসে ইরশাদ করেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি কোন বেদ'আতীকে ভীতি প্রদর্শন করবে, আল্লাহ তা'আলা তার অন্তর শান্তি ও ঈমানের দ্বারা ভরে দিবেন, যে ব্যক্তি বেদ'আতীকে অবজ্ঞা করবে, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাকে নিরাপদে রাখবেন এবং যে ব্যক্তি সৎকাজে আদেশ ও গর্হিত কাজে নিষেধ করবে, সে ইহজগতে

আল্লাহ্ তা'আলার এবং তাঁর কিতাব ও রাসূলের খলীফা তথা প্রতিনিধি হিসাবে মনোনীত হবে।' হযরত হুযাইফা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, 'এই উম্মতের (অধঃপতনের) এমন এক সময় আসবে, যখন তাদের কাছে একটি মৃত গাধা 'অসৎ কাজে নিষেধ করা'র চাইতেও অধিক পছন্দনীয় হবে।'

একদা হযরত মূসা (আঃ) আরজ করেছিলেন ঃ 'হে আল্লাহ্! যে ব্যক্তি নিজের ভাইকে নেক কাজের উপদেশ দেয় এবং মন্দ কাজ হতে বিরত রাখে, তার প্রতিদান কি?' আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,—'আমি তার প্রতিটি কথার বিনিময়ে এক বৎসরের ইবাদতের সওয়াব দিবো এবং এমন ব্যক্তিকে জাহান্নামের শাস্তি দিতে আমি লজ্জাবোধ করি।'

হাদীসে কুদসীতে আছে,—'আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ 'হে আদম সন্তান! তুমি ঐসব লোকের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না, যারা তওবা করতে বিলম্ব করে, দীর্ঘ আশা পোষণ করে, আমলবিহীন অবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়, পুণ্যবান লোকের ন্যায় কথা বলে ; অথচ তার আমল হয় মুনাফিকের মত। মনোবাঞ্ছা পূরণ হলেও তুষ্ট হয় না এবং মনের আশা অপূর্ণ থাকলে ছবরও করে না। পুণ্যবান লোকদের প্রতি আসক্ত হয় ; অথচ সে নিজে পুণ্যবান নয়। মুনাফিকদেরকে ঘৃণা করে ; অথচ সে নিজে তাদের অন্তর্ভুক্ত। নেক কাজে উপদেশ দেয় না এবং সে নিজেও নেক কাজ করে না। অসৎ কাজে প্রতিরোধ করে না এবং সে নিজেও অসৎ কাজ হতে বিরত হয় না।'

হযরত আলী (রাযিঃ) বলেন ঃ 'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, শেষ যমানায় কিছু লোক এমন হবে, যাদের বয়স হবে অল্প এবং আকল-বুদ্ধিও হবে কম। তারা কথা বলবে চমৎকার ও আকর্ষণীয় ; কিন্তু তাদের অন্তরে সেগুলোর কোন প্রতিক্রিয়া বা তদনুযায়ী আমল বলতে কিছু থাকবে না। তারা দ্বীন হতে এমনভাবে বের হয়ে যাবে, যেমন তীর শিকার হতে বের হয়ে যায়।'

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ 'মিরাজের রাত্রিতে আমি একদল লোক দেখেছি, যাদের ঠোঁট আগুনের কাঁচি দ্বারা কাটা হচ্ছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম,—'হে জিব্‌রাঈল! এরা কারা?' তিনি

বললেন ঃ এরা আপনার উম্মতের খতীব বা ওয়াজ-নসীহতকারী লোক, অন্যদেরকে তারা ভাল কাজের আদেশ-উপদেশ করতো ; অথচ নিজেরা সে অনুযায়ী আমল করতো না। যেমন কুরআন পাকে এহেন লোকদের সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে ঃ

أَتَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ○

'তোমরা কি মানুষকে সৎকর্মের নির্দেশ দাও এবং নিজেরা নিজেদেরকে ভুলে যাও ; অথচ তোমরা কিতাব পাঠ কর? তবুও কি তোমরা চিন্তা করো না।' (বাক্বারাহ ঃ ৪৪)

অর্থাৎ,—তোমরা আল্লাহর কালাম তিলাওয়াত কর ; অথচ সেই কালামের বিধি-বিধান অনুযায়ী আমল করো না। তাদের অবস্থা এই ছিল যে, দান-খয়রাতের জন্য তারা অন্যকে উপদেশ দিতো ; কিন্তু নিজেরা দান-খয়রাত করতো না। অতএব, ঈমানদার ব্যক্তির অপরিহার্য কর্তব্য হচ্ছে, অন্যকে সৎকাজে উপদেশ ও অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখার সাথে সাথে নিজের ব্যাপারে বিস্মৃত না হওয়া তথা নিজেও আমল ও ইবাদতে আত্মনিয়োগ করা।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

'ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী একে অপরের সহায়ক। তারা ভাল কাজের শিক্ষা দেয় এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।' (তওবা ঃ ৭১)

উক্ত আয়াতে মু'মিন ব্যক্তিদের গুণ বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা সৎকাজের উপদেশ দেয়। সুতরাং যে ব্যক্তি সৎকাজের উপদেশ প্রদানকার্য পরিহার করবে, সে আয়াতে উল্লেখিত মু'মিনদের অন্তর্ভুক্ত থাকবে না। পক্ষান্তরে আল্লাহ তা'আলা ওইসব লোকের দোষ ও অপযশ বর্ণনা করেছেন, যারা

নেক কাজের হুকুম পরিহার করেছে। ইরশাদ হয়েছে ঃ

كَانُوْا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنْكَرٍ فَعَلُوْهُ ۗ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ۝

'তারা পরস্পর মন্দ কাজে নিষেধ করতো না, যা তারা করতো। তারা যা করতো তা' অবশ্যই মন্দ ছিল।' (মায়িদাহ ঃ ৭৯)

হযরত আবুদ্দারদা (রাযিঃ) বলেছেন,—'তোমরা সৎকাজে আদেশ কর। অন্যথায় আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের উপর জালেম বাদশাহর আধিপত্য স্থাপন করে দিবেন, যে তোমাদের বড়দের কোন পরওয়া করবে না এবং ছোটদের প্রতি দয়াশীল হবে না। তোমাদের মধ্যে নেক ও পুণ্যবান লোকগণ আল্লাহ্র কাছে দো'আ করবে ; কিন্তু তা' কবুল হবে না। তারা আল্লাহ্র কাছে সাহায্য প্রার্থনা করবে ; কিন্তু তাদেরকে সাহায্য করা হবে না। তারা ক্ষমা প্রার্থনা করবে ; কিন্তু তাদেরকে ক্ষমা করা হবে না।'

হযরত আয়েশা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত যে, হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ 'আল্লাহ্ তা'আলা (পুর্বকালে) এমন একটি জনপদের উপর আযাব নাযিল করেছেন, যার অধিবাসীর সংখ্যা ছিল আঠারো হাজার। তারা প্রত্যেকেই এতো পুণ্যবান ছিল যে, আমল ও ইবাদতে নবী-রাসূলদের সমতুল্য ছিল।' আমি জিজ্ঞাসা করলাম,—হে আল্লাহ্র রাসূল! তাদেরকে ধ্বংস করার কারণ কি? তিনি বললেন ঃ 'এর কারণ হচ্ছে, তারা লোকদেরকে না-ফরমানীর কাজে লিপ্ত দেখে রাগান্বিত হতো না, নেক কাজের হুকুম করতো না এবং অসৎ কাজে নিষেধ করতো না।'

হযরত আবূ যর গেফারী (রাযিঃ) বলেন,—'একদা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা এক জিহাদ ; কিন্তু এছাড়াও কি কোন প্রকার জিহাদ আছে? আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,—'অবশ্যই আছে ; হে আবূ বকর! আল্লাহ্র যমীনে এমনও জিহাদকারী লোক রয়েছে, যারা শহীদগণের চাইতেও উত্তম ; অথচ শহীদগণের ফযীলত হচ্ছে,—তাঁরা আল্লাহ্র কাছে জীবিত এবং জীবিকাপ্রাপ্ত, তাঁরা যমীনে বিচরণ করে, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাগণের সম্মুখে গৌরব করেন, তাদের জন্য জান্নাত সুসজ্জিত করা হয় যেমন উম্মে সালামাহ আল্লাহ্র রাসূলের জন্য সজ্জিতা হয়ে থাকেন।

হযরত আবূ বকর (রাযিঃ) আরজ করলেন,—ইয়া রাসূলাল্লাহ! শহীদগণের চাইতেও অধিক মর্যাদার অধিকারী মুজাহেদীন যারা, তাঁরা কারা? তিনি বললেন, 'তাঁরা হচ্ছে সৎকাজের উপদেশদাতা, অসৎ কাজে প্রতিরোধকারী, আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশে ভালবাসা স্থাপনকারী এবং তাঁরই সন্তুষ্টিবিধানে শত্রুতাপোষণকারী লোকগণ।' অতঃপর আল্লাহ্র রাসূল আরও বললেন ঃ আল্লাহ্র কসম, আখেরাতে এমন হবে যে, বান্দা সর্বোচ্চ কোঠরীতে অবস্থান করবে, এই কোঠরীর নীচে আরও অনেক কোঠরী থাকবে। এগুলো শহীদগণের কোঠরীর তুলনায় অধিক উন্নত ও মূল্যবান হবে। তাদের প্রতিটি কামরায় মহামূল্য পাথর ইয়াকূত ও জমরদ খচিত তিনশত দরজা হবে। প্রতিটি দরজায় অতি উজ্জ্বল নূরের ব্যবস্থা থাকবে। এই বান্দা ডাগর চোখবিশিষ্ট নত নয়না তিন লক্ষ বেহেশতী হূরকে বিবাহ করবে। এদের কারও প্রতি সেই বান্দা যখন তাকাবে, তখন হূর তরুণী বলবে,—'আপনি অমুক অমুক দিন সৎকাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করেছিলেন।' এভাবে সে যে কোন হূরের প্রতি যখন দৃষ্টি করবে, তখন সৎকাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধের কথা উল্লেখ করে এর বিনিময়ে তাকে দেওয়া বিভিন্ন উচ্চতর মর্যাদা ও পুরস্কারের বিষয় বলতে থাকবে।

রেওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ 'হে মূসা! তুমি কি আমার জন্য কোন আমল করেছো?' তিনি বললেন,—'হে আল্লাহ্! আমি তোমার জন্য নামায পড়েছি, রোযা রেখেছি, একমাত্র তোমার সন্তুষ্টির জন্য সিজদা করেছি, তোমরা প্রশংসা করেছি, তোমার কিতাব তিলাওয়াত করেছি, যিকর করেছি।' আল্লাহ্ তা'আলা বললেন ঃ 'হে মূসা! নামায তোমার জন্য দলীলস্বরূপ, রোযার বিনিময়ে তুমি জান্নাত পাবে, দান-খয়রাত তোমার জন্য ছায়ার কাজ দিবে, তসবীহ তোমার জন্য জান্নাতে বৃক্ষস্বরূপ হবে, আমার কিতাব তিলাওয়াতের প্রতিদানে তুমি জান্নাতে হূর ও উন্নত বালাখানা লাভ করবে, যিকর তোমার নূর হবে ; কিন্তু খালেস আমার জন্য তুমি কি করেছো? তা' বল।' হযরত মূসা (আঃ) আরজ করেছেন,—'হে পরওয়ারদিগার! আপনি আমাকে কোন আমলের কথা বলে দিন, যা আমি খালেসভাবে আপনার জন্য করবো।' আল্লাহ্ তা'আলা বললেন ঃ 'হে মূসা! তুমি কি আমার খাতিরে

আমার কোন ওলী (দোস্ত)–কে ভালবেসেছো? অথবা আমার খাতিরে কাউকে শত্রু জ্ঞান করেছো?' একথা শুনার পর হযরত মূসা (আঃ) বুঝে গেছেন যে, আল্লাহ্‌র মহব্বতে কাউকে ভালবাসা এবং তাঁরই খাতিরে কাউকে শত্রু জ্ঞান করাই হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বশ্রেষ্ঠ আমল।

হযরত আবূ উবাইদাহ্‌ ইব্‌নে জাররাহ (রাযিঃ) বলেন ঃ আমি আরজ করেছি ঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ্‌র সর্বশ্রেষ্ঠ শহীদ কে?' হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি অত্যাচারী শাসককে সৎকাজের উপদেশ দেয় এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করে, অতঃপর সে তাকে হত্যা করে ফেলে। যদি হত্যা না–করে, তা'হলেও সে তার দায়িত্ব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে যাবে ; যতদিন সে দুনিয়াতে বেঁচে থাকবে।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন ঃ 'হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, 'আমার উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে সে, যে জালেম বাদশাহ্‌কে সৎকাজের আদেশ করে ও অসৎ কাজে নিষেধ করে, অতঃপর সেই জালেম তাকে হত্যা করে ফেলে। এই শহীদ ব্যক্তির স্থান জান্নাতে হযরত হাম্‌যাহ্‌ ও জা'ফর (রাযিঃ)–এর মাঝখানে হবে।

আল্লাহ্‌ তা'আলা হযরত ইউশা' ইব্‌নে নূন আলাইহিস্‌ সালামের নিকট ওহী পাঠালেন যে, 'আমি তোমার উম্মতের চল্লিশ হাজার সৎ এবং ষাট হাজার অসৎ লোককে ধ্বংস করার ইচ্ছা করেছি।' হযরত ইউশা' (আঃ) আরজ করলেন, 'ইয়া আল্লাহ্‌। এই অসৎ লোকজন তো অবশ্যই ধ্বংস হওয়ার উপযুক্ত ; কিন্তু সৎ লোকদেরকে ধ্বংস করার কারণ কি?' আল্লাহ্‌ আ'আলা বললেন ঃ 'আমার ক্রোধের কারণ হয় এমন কাজ কাউকে করতে দেখে তারা ক্রুদ্ধ হয় না এবং এহেন লোকদের সাথে তারা একত্রে পানাহার করে। তাই আমি তাদেরকেও ধ্বংস করে দিচ্ছি।'

হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন,—'একদা আমি হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করলাম ঃ 'আমরা কি কোন সৎকাজে উপদেশ দিতে ওই পর্যন্ত বিরত থাকবো, যতক্ষণ পর্যন্ত নিজেরা পূর্বে আমল করতে না পারি? এবং অনুরূপ কি আমরা অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করতে বিরত থাকবো, যতদিন পর্যন্ত নিজেরা বিরত হতে না পারি?' হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ না, তোমরা সৎকাজের হুকুম

করতে থাক, যদিও তোমরা সে অনুযায়ী পূর্ণভাবে আমল করতে পার নাই। অনুরূপ তোমরা অসৎ কাজে নিষেধ করতে থাক, যদিও তা থেকে তোমরা বিরত হতে পার নাই।

জনৈক বুযুর্গ আপন পুত্রকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছেন ঃ 'যদি কেউ নেক কাজের উপদেশ দিতে চায়, তা' হলে সর্বপ্রথম তাকে ধৈর্য–সহিষ্ণুতায় অভ্যস্ত হতে হবে এবং আল্লাহ্‌র কাছে এর সওয়াব ও প্রতিদানের দৃঢ় ইয়াকীন রাখতে হবে। তা' হলে লোকজনের দুর্ব্যবহারে সে কখনও ব্যথিত হবে না।'

অধ্যায় ঃ ১৬

শয়তানের শত্রুতা

প্রত্যেক মু'মিনের কর্তব্য হচ্ছে,—আলেম-উলামা এবং পুণ্যবান লোকদের সাথে সম্পর্ক রাখা, তাদেরকে আন্তরিকভাবে মহব্বত করা এবং সর্বদা তাদের সাহচর্যে উঠাবসা করা। তাদের কাছ থেকে দ্বীনি ইল্ম হাসিল করা, তাদের উপদেশ ও পরামর্শ অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা। গর্হিত ও অসৎকর্ম থেকে সর্বদা বিরত থাকা এবং শয়তানকে শত্রু জ্ঞান করা। যেমন আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন ঃ

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا

'শয়তান তোমাদের শত্রু ; অতএব তাকে শত্রুরূপেই গ্রহণ কর।' (ফাতির ঃ ৬)

অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত ও বন্দেগীর মাধ্যমে শয়তানের বিরুদ্ধে শত্রুতা ঘোষণা কর এবং শয়তানের অবাধ্যতা ও না-ফরমানী করে তাকে দমিত ও পরাজিত কর। প্রতি কাজে ও প্রতি ক্ষেত্রে সর্বাবস্থায় অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে শয়তানের মোকাবেলা করতে থাক। সর্বপ্রকার ধ্যান-ধারণা ও আকীদা বিশ্বাসে শয়তানের ধোকা ও প্রতারণা থেকে সতর্ক থাক। যখনই কোন কাজ কর, তখন এ ব্যাপারে সচেতন থেকো যে, এতে শয়তানী প্রতারণার কোন দিক এসে যাচ্ছে কিনা? কেননা শয়তান কখনও ইবাদতে রিয়া প্রবেশ করিয়ে দেয়, আবার কখনও পাপকর্মকে সুন্দর ও নেক কাজের আকৃতি দিয়ে পেশ করে। এ ব্যাপারে আল্লাহ্র সাহায্য ও আশ্রয় প্রার্থনা কর।

হযরত আবদুল্লাহ ইব্নে মাসউদ (রাযিঃ) বলেছেন ঃ 'একদা হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাটির উপর একটি রেখা টেনে বললেন, 'এটা হচ্ছে, আল্লাহ্র পথ'। অতঃপর ডানে-বামে আরও কতকগুলো রেখা আঁকলেন এবং বললেন যে, এগুলোও পথ ; কিন্তু এর

প্রত্যেকটির উপর শয়তান বসে আছে এবং লোকজনকে (ধ্বংস ও বিভ্রান্তির দিকে) আহ্বান করছে। তারপর তিনি নিম্নের আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন ঃ

إِنَّ هٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ۰

'নিশ্চিত এটি আমার সরল পথ। অতএব এ পথে চল এবং অন্যান্য পথে চলো না। তা' হলে সেসব পথ তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিবে।' (আন'আম ঃ ১৫৩)

উক্ত হাদীস শরীফে হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে শয়তানের প্রতারণার বিভিন্ন পথ সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছেন।

আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে যে, বনী ইসরাঈল গোত্রে একজন পাদ্রী ছিল। একদা ইবলীস শয়তান তাকে প্রতারিত করার জন্য ফন্দি করলো যে, এক বাড়ীতে এসে একটি মেয়ের গলা টিপে ধরলো। তাতে সে মেয়েটি মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে। এরপর শয়তান বাড়ীর লোকদের মনে এ ধারণা জন্মিয়ে দিল যে, পাদ্রীর নিকট এই রোগীর চিকিৎসা-তদবীর আছে। সুতরাং তারা মেয়েটিকে নিয়ে পাদ্রীর নিকট এসে বললো, তাকে আপনার নিকট রাখুন। পাদ্রী তাকে নিজের হেফাযতে রাখতে অস্বীকার করলো। কিন্তু অভিভাবকদের বার বার অনুরোধে অবশেষে রাজী হয়ে গেল এবং তাকে তার হেফাযতে রেখে চিকিৎসা করতে লাগলো। কিছুদিন পর শয়তান পাদ্রীর মনে কুমন্ত্রণা দিতে লাগলো। ফলে, পাদ্রী মেয়েটির সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে গেল। এভাবে একদিন সে পাদ্রী কর্তৃক গর্ভধারণ করলো। অতঃপর শয়তান পাদ্রীর মনে এই মর্মে ওয়াস্ওয়াসাহ্ সৃষ্টি করলো যে, তার অভিভাবকদের নিকট তুমি কি উত্তর দিবে ; তারা এসে যখন দেখবে তাদের মেয়ে গর্ভধারণ করেছে, তখন তোমাকেই দায়ী করবে এবং এভাবে তুমি তোমার মান-সম্মান সবই হারাবে। সুতরাং শয়তান তাকে উপায় শিখিয়ে দিল যে, এখন তুমি মেয়েটিকে হত্যা করে মাটির নীচে

পুঁতে ফেল, এভাবে তোমার সব সমস্যা চুকে যাবে ; অভিভাবকরা এসে তোমাকে জিজ্ঞাসা করলে বলবে, সে মারা গেছে। পাদ্রী তাই করলো। এদিকে শয়তান অভিভাবকদের নিকট এসে তাদের মনেও এ বিষয়ে কুমন্ত্রণা সৃষ্টি করলো। অভিভাবকরা এসে পাদ্রীর নিকট মেয়ের খোঁজ নিল। পাদ্রী বললো, সে মারা গেছে। একথা শুনে তারা এতটুকু বিশ্বাস করলো না ; পাদ্রীকে অপরাধী সাব্যস্ত করে তাকে হত্যা করার জন্য শূলিতে নিয়ে গেল। তখন শয়তান তার নিকট হাজির হয়ে বললো,—তুমি আমাকে চিন? আমি নিজেই মেয়ের গলা টিপে ধরেছিলাম, মেয়ের অভিভাবকদের পরামর্শ দিয়েছিলাম এবং তোমার অন্তরে ওয়াস্‌ওয়াসাহ্ দিয়েছিলাম। এখন যদি তুমি এহেন বিপদ থেকে রক্ষা পেতে চাও, তা' হলে আমার কথা শুন। পাদ্রী বললো,—কি কথা? শয়তান বললো,—খুবই সহজ, তুমি শুধু আমাকে দুটি সিজদা কর। পাদ্রী কোন উপায়ান্তর না দেখে শয়তানকে সিজদা করে কাফের হয়ে গেল। শয়তান পাদ্রীকে উপহাস করতে করতে পলায়ন করলো। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ ـ

'তারা শয়তানের মত ; মানুষকে কাফের হতে বলে। অতঃপর যখন সে কাফের হয়, তখন শয়তান বলে ঃ তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নাই।' (হাশ্‌র ঃ ১৬)

বর্ণিত আছে, একদা অভিশপ্ত ইবলীস হযরত ইমাম শাফেঈ (রহঃ)—কে প্রশ্ন করেছিল,—এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কি? যে, সৃষ্টিকর্তা আমাকে তাঁর ইচ্ছানুযায়ী সৃষ্টি করেছেন এবং যে কাজে ইচ্ছা সে কাজে আমাকে ব্যবহার করছেন। অতঃপর তিনি যদি ইচ্ছা করেন, তবে বেহেশ্‌ত দিবেন নতুবা দোযখে নিক্ষেপ করবেন ; সবই দেখি তাঁর ইচ্ছা—এটা কি কোন ইনসাফ বা ন্যায়ানুগ কাজ হলো, না তিনি জুলুম করলেন? ইমাম শাফেঈ (রহঃ) একটু চিন্তা করে বললেন ঃ 'সৃষ্টিকর্তা যদি তোকে তোর অভিপ্রায় অনুযায়ী সৃষ্টি করে থাকেন, তা' হলে অবশ্যই এটা জুলুম হবে, আর যদি

তিনি তাঁর নিজস্ব মর্জ্জি অনুযায়ী সৃষ্টি করে থাকেন, তা' হলে স্মরণ রাখ যে, মহান সৃষ্টিকর্তা স্বীয় অভিপ্রায়ে সকল প্রকার প্রশ্ন ও জবাবদিহি হতে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র।' এ কথা শুনে শয়তান বিফল-বিমুখ হয়ে পালালো এবং বলতে থাকলো,—'হে শাফেঈ! আমি এই একটিমাত্র প্রশ্নের দ্বারা সত্তর হাজার আবেদ ও খোদাভীরু লোককে গোমরাহ্ করেছি এবং উবুদিয়তের খাতা হতে তাদের নাম কাটিয়ে দিয়েছি।

হে সাধক! এ কথা স্মরণ রেখো যে, তোমার অন্তর হচ্ছে দুর্গস্বরূপ আর শয়তান হচ্ছে তোমার দুশমন। শয়তান সর্বদা এই চেষ্টায় নিরত থাকে যে, কি করে সে অন্তররূপ দুর্গে প্রবেশ করে সেটাকে নিজের দখলে আনতে পারে। বস্তুতঃ দুর্গের হিফাযতের জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন হচ্ছে দুর্গের দরজাসমূহ সংরক্ষিত করা। এজন্যে আগেই তোমাকে দুর্গের সংরক্ষণ-পদ্ধতি সম্পর্কে ওয়াকেফহাল হতে হবে। তা' না' হলে শত্রুর আক্রমণ ও ক্ষতিসাধন থেকে আত্মরক্ষা করা সম্ভব হবে না। সুতরাং অন্তররূপ দুর্গকে বনী আদমের চিরশত্রু শয়তানের আক্রমণ ও কুমন্ত্রণা থেকে হিফাযত করা যেমন ফরয, তেমনি এই প্রক্রিয়া-প্রণালী সম্পর্কেও অবগত হওয়া ফরয বা অপরিহার্য কর্তব্য। কারণ, এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, যে জ্ঞান ও ইল্‌মের উপর কোন ফরয আমল নির্ভর করে, সেই জ্ঞান ও ইল্‌ম হাসিল করাও ফরয হিসাবে পরিগণিত হয়। সুতরাং শয়তানের ধোকা ও প্রতারণার চক্রজাল সম্পর্কে ওয়াকেফহাল না হলে যেহেতু আত্মরক্ষা করা সম্ভব হবে না,—যা মুলতঃ ফরয—সেজন্যে শয়তানের ধোকা ও কুমন্ত্রণার প্রক্রিয়া-প্রণালী সম্পর্কেও জ্ঞান আহরণ করা বান্দার উপর ফরয।

আদম সন্তানকে প্রতারিত করার জন্য চিরশত্রু শয়তান বহুবিধ প্রক্রিয়া-প্রণালী অবলম্বন করে থাকে। ওয়াস্‌ওয়াসা ও কুমন্ত্রণার বিভিন্ন দরজাপথে সে মানবের হৃদয়দুর্গে প্রবেশ করে ক্ষতিসাধন করার নিমিত্ত সদাব্যস্ত ও সচেষ্ট থাকে। বস্তুতঃ এগুলো মানবের মধ্যকার বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ কুপ্রবৃত্তিসমূহেরই নামান্তর। আলোচ্য ক্ষেত্রে সেগুলোর কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

এক,—ক্রোধ ও কামাসক্তি। বস্তুতঃ ক্রোধ মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধিকে বিলুপ্ত করে দেয়। আর এই জ্ঞান-বুদ্ধির দুর্বলতা ও হ্রাসপ্রাপ্তির মুহূর্তেই শয়তান

মানুষের উপর হামলা করার সুযোগ পায়। এ সময় শয়তান মানুষকে খেলার বস্তুতে পরিণত করে এবং ফুটবলের মত তাকে ব্যবহার করে, যেমন শিশু-কিশোররা এ দিয়ে ইচ্ছামত খেলা করে থাকে। বর্ণিত আছে,—একদা জনৈক বুযুর্গ শয়তানকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন,—তুমি বনী আদমকে কিভাবে পরাজিত কর? শয়তান বলেছে, আমি তাদেরকে গোস্সা ও কামাসক্তির সময়গুলোতে হামলা করে থাকি।

দুই,—হিংসা ও লোভ-লালসা। এ দুই প্রবৃত্তির কারণে মানুষ জগতের প্রতিটি বস্তুর প্রতি লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। তখন সে চোখ থাকতেও অন্ধ হয়ে যায় এবং কান থাকতেও বধিরে পরিণত হয়, হক ও প্রকৃত কর্তব্যের অনুভূতি সে পূর্ণতঃ হারিয়ে ফেলে। এ সুযোগে শয়তান তখন তার উপর উত্তমরূপে সওয়ার হয়ে বসে। এভাবে ক্রমান্বয়ে শয়তান তার অন্তরে কামভাবের সৃষ্টি করে, তখন সে চরম ঘৃণ্য ও লজ্জাকর কর্মেও লিপ্ত হতে দ্বিধাবোধ করে না।

বর্ণিত আছে যে, হযরত নূহ্ আলাইহিস্ সালাম যখন আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশক্রমে কিশ্তীতে সওয়ার হলেন এবং জীব-জন্তুর এক এক জোড়া সাথে উঠিয়ে নিলেন, তখন নৌকাতে একজন বৃদ্ধলোকের প্রতি তাঁর দৃষ্টি পড়লো। হযরত নূহ্ (আঃ) তাকে চিন্‌তে না পেরে জিজ্ঞাসা করলেন,—'তোমাকে এই কিশ্তীতে উঠার কে অনুমতি দিয়েছে?' বৃদ্ধ বললো,—আমি এজন্যে আরোহন করেছি, যাতে আপনার আহ্বানে সাড়া দানকারী ঈমানদার লোকদের হৃদয়াভ্যন্তরে প্রবেশ করে আমি তাদেরকে কুমন্ত্রণা দিতে পারি, ফলে তাদের অন্তর থাকবে আমার সাথে এবং আপনার সাথে থাকবে শুধু তাদের বাহ্যিক দেহাবয়ব। হযরত নূহ্ (আঃ) বললেন,—'হে অভিশপ্ত ইবলীস! খোদার দুশমন! তুই এখান থেকে বের হয়ে যা।' এ সময় ইবলীস যে কথাটি বলেছিল তা' হচ্ছে,—'হে নূহ্! আমি পাঁচটি বিষয়ের দ্বারা মানুষকে ধ্বংস করে থাকি।' আল্লাহ্ তা'আলা হযরত নূহ্ আলাইহিস্ সালামকে ওহী পাঠালেন ঃ 'হে নূহ্! তুমি তাকে শুধু দু'টি বিষয়ের কথা জিজ্ঞাসা কর, অপর তিনটি বিষয় তোমার জানার প্রয়োজন নাই।' হযরত নূহ্ (আঃ) জিজ্ঞাসা করলে ইবলীস বললো,—সেই দু'টি বিষয় এমন, যা আমি ব্যক্ত করার পর আপনি আমার কথার বাস্তবতা স্বীকার করতে বাধ্য

হবেন ; কিন্তু সেজন্যে আমাকে যেন আপনি বঞ্চিত করে পশ্চাতে ফেলে না রাখুন। বিষয় দু'টি হচ্ছে,—লোভ-লালসা ও হিংসা-বিদ্বেষ। 'বস্তুতঃ এই হিংসার তাড়নায় আমি নিজে অভিশপ্ত হয়ে জান্নাত থেকে বহিস্কৃত হয়েছি। আর লোভ-লালসা সেই ব্যাধি যা হযরত আদম আলাইহিস্ সালামকে বেহেশ্‌তে নিষিদ্ধ ফল খেতে উদ্বুদ্ধ করেছে। তারপর থেকে আমি বনী আদমকে শিকার করার জন্য লোভ-লালসার হাতিয়ার ব্যবহার করে থাকি।

তিন,—উদরপূর্তি করে খাওয়া। সম্পূর্ণ হালাল ও পাক-পবিত্র খাদ্যদ্রব্যও অধিক পরিমাণে ভক্ষণ করলে কামপ্রবৃত্তি প্রবল হয়ে উঠে। এটাকেও শয়তান হাতিয়ারস্বরূপ ব্যবহার করে থাকে।

বর্ণিত আছে যে, একদা অভিশপ্ত ইবলীস হযরত ইয়াহ্‌য়া আলাইহিস্ সালামের সম্মুখে হাজির হলে তিনি লক্ষ্য করলেন যে, ইবলীসের সর্বশরীরে বিভিন্ন ধরণের সামগ্রীতে পরিপূর্ণ প্রচুর পাত্র দেখা যাচ্ছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন,—এ পাত্রগুলো কিসের দ্বারা পরিপূর্ণ করা হয়েছে? ইবলীস বললো, 'এগুলো কামপ্রবৃত্তি ও খাহেশাত দ্বারা পূর্ণ করে রেখেছি, বনী আদমকে আমি এগুলোর সাহায্যে শিকার করে থাকি। হযরত ইয়াহ্‌য়া জিজ্ঞাসা করলেন,—আমাকে শিকার করার জন্যেও কি এতে কোন ফাঁদ আছে? সে বললো,—জী-হাঁ, কখনও কখনও আপনি পূর্ণ তৃপ্তি সহকারে পানাহার করে থাকেন, তখন আমি আপনাকে নামায ও আল্লাহ্‌র যিক্‌র হতে গাফেল করে দিই। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন,—আরও কিছু আছে? শয়তান বললো,—আর কিছু নাই। অতঃপর হযরত ইয়াহ্‌য়া আলাইহিস্ সালাম বললেন,—আমি আল্লাহ্‌কে সাক্ষী রেখে দৃঢ়ভাবে প্রতিজ্ঞা করছি, আজ থেকে আর কোনদিন আমি উদরপূর্তি করে খাবো না। ইবলীস বললো,—আজ থেকে আমিও দৃঢ় সংকল্প করছি যে, কোনও দিন আমি কোনও মুসলমানকে সদুপদেশ দিবো না।'

চার,—বাড়ী-ঘর, পোষাক-পরিচ্ছদ, দ্রব্য-সামগ্রী ও গৃহ-উপকরণে সাজ-সজ্জা ও চাকচিক্যের অভিলাষী হওয়া। শয়তান যখন কারও অন্তরে এসব অহেতুক বিষয়ের প্রবলতা প্রত্যক্ষ করে, তখন সে তার উপরে উত্তমরূপে চেপে বসে এবং সর্বদা তাকে গৃহ নির্মাণ, গৃহের ছাদ ও দেওয়াল মেরামত, বাড়ী প্রশস্তকরণ এবং এগুলোর সাজ-সজ্জা ও চাকচিক্যের মধ্যে ব্যাপৃত

করে রাখে। কিভাবে সুন্দর ও আকর্ষণীয় পোষাক-পরিচ্ছদের ব্যবস্থা করা যায়, কিভাবে প্রচুর সম্পদের অধিকারী হওয়া যায় কেবল এহেন চিন্তায় তাকে উন্মত্ত করে রাখে। তার অন্তঃকরণে এ কথা বলে কুমন্ত্রণা দেয় যে, তোমার আয়ু অনেক দীর্ঘ, বহুকাল তুমি দুনিয়াতে বাঁচবে। এসব ধোকা ও প্রতারণার জালে তাকে আবদ্ধ করার পর শয়তান তার সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়ে যায়, পুনঃ পুনঃ তার কাছে এসে তাকে প্রতারিত করার আর কোন প্রয়োজন থাকে না। ফলে, অনেকেই এহেন জঘন্য অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করে এবং তাদের আখেরাত সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়।

পাঁচ,—আল্লাহ্ তা'আলার কাছে আশা না করে গায়রুল্লাহ্ তথা মানুষের কাছে আশা করা এবং তাদের সাহায্য ও সম্পদের উপর ভরসা করা। হযরত ছফওয়ান ইব্‌নে সুলাইমান (রহঃ) বলেন,—একদা হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে হানযালা (রাযিঃ)-এর নিকট অভিশপ্ত ইবলীস উপস্থিত হয়ে বলেছিল ঃ 'হে ইব্‌নে হানযালা! আমি আপনাকে একটি তত্ত্বকথা শিক্ষা দিচ্ছি, আপনি মনোযোগ সহকারে তা' শ্রবণ করুন এবং স্মরণ রাখুন।' তিনি বললেন,—আমার সেকথা জানার কোন প্রয়োজন নাই। ইবলীস বললো,—আপনি প্রথমে শুনে নিন, তারপর যদি আপনার পছন্দ হয়, তবে গ্রহণ করবেন, নতুবা প্রত্যাখ্যান করবেন—'হে ইব্‌নে হানযালা! একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার কাছেই সমুদয় বিষয়ে আশা করুন এবং তাঁরই নিকট সবকিছুর প্রার্থনা করুন, অন্যদের কাছে সর্বপ্রকার আশা-আকাঙ্খা পরিহার করুন। আপনি যখন কারও প্রতি রাগান্বিত হন, তখন নিজের ধ্বংসের ব্যাপারে সতর্ক থাকুন, কেননা আমি ক্রোধের সুযোগে মানুষের উপর ক্ষমতা প্রয়োগ করে থাকি।'

ছয়,—কাজে-কর্মে অস্থির হওয়া এবং দৃঢ়তা ও অবিচলতা পরিত্যাগ করা। হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ কাজে-কর্মে অস্থিরতা ও তাড়াহুড়া করা শয়তানের অভ্যাস ; শয়তানের পক্ষ থেকেই এ ভাব ও মানসিকতা সৃষ্টি করা হয়। পক্ষান্তরে স্থিরতা ধীরতা ও চিন্তা-ফিকির করে কাজ করার তাওফীক খাসভাবে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে দেওয়া হয়। বস্তুতঃ অস্থির চিত্ত নিয়ে কাজ করার সময় শয়তান এমনভাবে মানুষের ক্ষতিসাধন করে থাকে যে, সে তা' মোটেও অনুভব

করতে পারে না।

বর্ণিত আছে, যখন হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম জন্মগ্রহণ করলেন, তখন ইবলীসের শিষ্যরা ইবলীসের নিকট হাজির হয়ে বললো,—আজকে অকস্মাৎ বহু বুত-প্রতিমা ধ্বসে পড়েছে।' ইবলীস বললো,—'তা' হলে নিশ্চয়ই কোন বড় ঘটনা ঘটেছে, যার ফলে এমন হয়েছে। আচ্ছা, তোমরা অপেক্ষা কর ; আমি খোঁজ নিয়ে আসছি।' একথা বলে সে আকাশে উড়ে সমগ্র অঞ্চল এমনকি বিজন এলাকাগুলোও প্রদক্ষিণ করে কোন কিছুর সন্ধান পেল না। এমন সময় হঠাৎ কোন এক সূত্রে জানতে পেল যে, হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম জন্মগ্রহণ করেছেন এবং ফেরেশ্‌তাগণ চতুর্দিক থেকে তাঁকে বেষ্টন করে রেখেছে। তখন সে শিষ্যদের নিকট প্রত্যাবর্তন করে বললো ঃ 'অদ্য রাত্রে একজন নবীর জন্ম হয়েছে, ইতিপূর্বে যখনই কোন স্ত্রীলোকের সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে, আমি সেখানে উপস্থিত রয়েছি ; কিন্তু অদ্যকার রাত্রির ঘটনায় আমি উপস্থিত থাকতে পারি নাই।' বস্তুতঃ শয়তান তখন থেকেই বনী আদমকে মূর্তি পূজায় লিপ্ত করার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গিয়েছিল। তার শিষ্যদেরকে সে বলেছিল, আজ থেকে তোমরা যদি আদমের কোন ক্ষতি করতে চাও, তা' হলে তাড়াহুড়া এবং আলস্য ও মন্থরতার হাতিয়ার ব্যবহার কর।

সাত,—সোনা-রূপা, অর্থসম্পদ ও রকমারী মাল সামান। যেমন গৃহ-পালিত চতুষ্পদ জন্তু ও জায়গা-যমীন প্রভৃতি। এসব উপকরণ প্রয়োজনের অতিরিক্ত যতই যোগাড় করা হবে, নির্ঘাত সেগুলো শয়তানের আবাস ও আখড়ায় পরিণত হবে।

হযরত সাবেত বুনানী (রহঃ) বলেন,—'যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নুবুওয়াত ও রিসালতের সম্মানে ভূষিত করা হলো, তখন শয়তান তার শিষ্যদেরকে বলেছিল,—'আজকে দুনিয়াতে কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে ; যাও, তোমরা তদন্ত করে আস বিষয়টা কি? শিষ্যরা বহু ঘুরে-ফিরে প্রত্যাবর্তন করে নিজেদের অপারগতা প্রকাশ করলো। শয়তান তখন নিজেই দায়িত্ব গ্রহণ করে বিষয়টি খোঁজ নেওয়ার জন্য বের হলো। বহু অনুসন্ধানের পর খোঁজ নিয়ে ফিরে এসে বললো,—আজকে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নুবুওয়াত প্রদান

করেছেন।' এরপর শয়তান তার শিষ্যদেরকে সাহাবায়ে কেরামের নিকট পাঠাতো, অন্ততঃ তাদেরকে যেন পথভ্রষ্ট করে আসে। কিন্তু তারা এ ব্যাপারেও কৃতকার্য হতো না ; ফিরে এসে সকলেই নিজেদের অপারগতা প্রকাশ করতো। শয়তান পুনর্বার তাদেরকে সাহাবায়ে কেরামের নামাযে ওয়াস্ওয়াসা সৃষ্টি করার জন্য পাঠাতো। এবারও তারা ফিরে এসে পূর্ববৎ ব্যর্থতার কথা ব্যক্ত করতো। অবশেষে শয়তান তাদেরকে বলেছে,—'হে আমার শিষ্যরা! তোমরা কিছুকাল অপেক্ষা কর, এমন এক সময় আসবে, যখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে পার্থিব সম্পদে প্রশস্ততা দান করবেন, তখন আমরা আমাদের পরিকল্পনায় কৃতকার্য হতে পারবো।'

বর্ণিত আছে যে, একদা হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম একটি পাথরের উপর মাথা রেখে শুয়েছিলেন। এমন সময় অভিশপ্ত ইবলীস তাঁর কাছে হাজির হয়ে বলতে লাগলো,—'হে ঈসা! আপনি তো দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গেছেন।' এ কথা শুনে হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম তৎক্ষণাৎ মাথার নীচ থেকে পাথরটি অপসারণ করে শয়তানের দিকে নিক্ষেপ করে বললেন,—'নিয়ে যা, দুনিয়ার এ অংশটুকুও তোকে দিয়ে দিলাম।

আট,—ধন-সম্পদে কৃপণতা করা এবং অভাব-অনটনের ভয়ে সদা সন্ত্রস্ত থাকা। এ দু'টি ব্যাধির কারণেই মানুষ আল্লাহ্র রাস্তায় দান-খয়রাত ও নেক কাজে আর্থিক সাহায্য-সহযোগিতা করার ব্যাপারে বাধাগ্রস্ত হয়ে থাকে এবং সর্বদা প্রচুর ধন-সম্পদ পুঞ্জীভূত করার নেশায় মেতে থাকে। পরিশেষে আখেরাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়া ছাড়া আর কোন উপায়ান্তর থাকে না। কৃপণতার আরেকটি ক্ষতি এই যে, এই ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তি সম্পদের প্রাচুর্য বৃদ্ধি করার মানসে সর্বদা হাটে-বাজারে ঘুরাফেরা করতে থাকে। অথচ বাজার হচ্ছে শয়তানের আখ্ড়া ও বিচরণক্ষেত্র।

নয়,—মাযহাবের ব্যাপারে গোড়ামি করা, নফস ও কাম-প্রবৃত্তির দাসত্ব গ্রহণ করা, শত্রুর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা, তাকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখা। বস্তুতঃ এগুলো হচ্ছে, আত্মার জন্য মারাত্মক ব্যাধি। এসব ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে ওলী-দরবেশ ও ফাসেক-ফাজের নির্বিশেষে বহু লোক ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে।

হযরত হাসান (রাযিঃ) বলেন ঃ এক বর্ণনায় প্রকাশ যে, অভিশপ্ত

ইবলীস বলেছে,—'আমি উম্মতে মুহাম্মাদীকে বহুবিধ পাপে লিপ্ত করেছি ; কিন্তু তওবা ও অনুতাপের দ্বারা তারা আমার কোমর ভেঙ্গে ফেলেছে। অবশেষে আমি তাদেরকে এমন পাপে লিপ্ত করার ফন্দি আঁটলাম, যা থেকে তারা কখনও তওবা করবে না ; তা' হচ্ছে, রিপুর অনুসরণ ও যথেচ্ছাচারিতা। অভিশপ্ত ইবলীস এক্ষেত্রে সত্যই বলেছে। কেননা সরলপ্রাণ বান্দারা এ কথা আদৌ জানে না যে, খাহেশ ও রিপুর অনুসরণে পাপের উপকরণ রয়েছে ; সুতরাং এক্ষেত্রে তাদের অন্তরে তওবার প্রশ্নই জাগ্রত হয় না।

দশ,—মুসলমানদের সম্পর্কে অন্তরে কুধারণা পোষণ করা। এটা জঘন্য পাপ। এ থেকে কঠোরভাবে পরহেয করা উচিত। অনুরূপ কাউকে কোন বিষয়ে অপবাদ দিতে নাই। বস্তুতঃ যে ব্যক্তি অপরের সম্পর্কে কুধারণা পোষণ করে, কারও সম্পর্কে অপবাদ রটায় বা দোষচর্চা করে, এটা মূলতঃ দোষ চর্চাকারী ব্যক্তিরই দুর্বলতা ; প্রকারান্তরে তার ভিতরগত অন্যায় ও অপরাধ-প্রবণতাই অন্যের প্রতি কুধারণা ও দোষচর্চার রূপ নিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে মাত্র। সুতরাং পুণ্যবান হতে হলে কর্তব্য হচ্ছে, এহেন দুরারোগ্য ব্যাধিসমূহকে সমূলে বিনাশ করে দেওয়া। এ ব্যাপারে সুচিকিৎসার জন্য অধিক পরিমাণে যিকরের সাহায্য নেওয়া উচিত।

ইব্নে ইসহাক বলেন ঃ যখন মক্কার কাফেররা দেখলো যে, সাহাবায়ে কেরাম ক্রমে ক্রমে হিজরত করে মদীনা অভিমুখে রওনা হচ্ছেন, তখন তাদের আন্দায হয়ে গেল যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম এখন আর মক্কায় অবস্থান না করে অন্যত্র (মদীনায়) অবস্থান গ্রহণ করে নিচ্ছেন। কাজেই তারা মহা চিন্তায় পড়ে গেল এবং তাদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টিপাত রাখতে আরম্ভ করলো। মুসলমানগণ সংঘবদ্ধ হয়ে তাদের উপর আক্রমণ করতে পারে—এ আশংকাও তারা করতে লাগলো। এ ব্যাপারে কি কর্মপন্থা গ্রহণ করা উচিত সেজন্যে তারা পরামর্শ করার উদ্দেশ্যে 'দারুন্নাদওয়া'তে (কা'বা সংলগ্ন গৃহে) এক গোপন সভা আহ্বান করলো। এটি ছিল কুছাই ইব্নে কিলাবের ঘর। এখানে তারা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সময়ে পরামর্শের জন্য সভা আহ্বান করতো। এ গৃহটির সঙ্গতিপূর্ণ নাম দিয়েছিল তারা دَارُالنَّدْوَةَ (বা সভাকক্ষ)। যখনই কুরাইশীদের কোন